সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। যৌথ নিরাপত্তা বলতে আপনি কী বোঝেন?

২। ক্ষুদ্র আঁতাত কোন কোন দেশগুলিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল?

৩। কোন কোন দেশের মধ্যে কোন সালে লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। জি. এম. গার্থোন-হার্ডি, এ শর্ট হিস্টরি অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ারস্ (১৯২০-১৯৩৯)(১৯৬৮)।

২। ই. এইচ. কার প্রণীত দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : ১৯১৯-১৯৩৯, ভাষান্তর ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৯০)।

শেষ পর্যন্ত অকার্যকর হয়ে পড়ে। ১৯৩১ সালে ইংরেজ ও ফরাসি সরকার নিরাপত্তাবিষয়ক সাধারণ আইন অনুমোদন করলেও জাতিসংঘের মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তা প্রচেষ্টা আগের উৎসাহ আর জাগিয়ে তুলতে পারেনি।

যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিধানের দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফ্রান্সের জনসংখ্যাগত দুর্বলতা, ভৌগোলিক অবস্থানগত দুর্বলতা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। অথচ জার্মানির শিল্পগত শক্তি প্রায় অটুট ছিল। জার্মানিতে সামরিক পুরুজ্জীবন ঘটলে কীভাবে তার মোকাবিলা করা যাবে তা নিয়ে ফরাসি কূটনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত হয়।

প্রথমে ফ্রান্স, ইংলন্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ফরাসী নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানায়। যখন ফ্রান্স দেখলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলন্ড এই দায়িত্ব স্বীকারে প্রস্তুত নয়, তখন সে দুটি বিকল্প পথ অবলম্বন করে ; সন্ধির মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ ও মৈত্রী চুক্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। ১৯২০ সালের পর জার্মানির পূর্ব সীমান্তে পোলান্ডের সঙ্গে এবং পশ্চিম সীমান্তে বেলজিয়ামের সঙ্গে ফ্রান্স মিত্রতা ও সামরিক চুক্তি সম্পাদিত করে। একইভাবে, ফ্রান্স ১৯২৪ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে, ১৯২৬ সালে রুমানিয়ার সঙ্গে এবং ১৯২৭ সালে যুগোশ্লোভিয়ার সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হয়। এই চুক্তিগুলিতেও পারস্পরিক সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

অধ্যাপক ই. এইচ. কারের মতে প্রচুর রণসম্ভার এবং বিশাল বিজয়ী সেনাবাহিনীতে সুসজ্জিত ফ্রান্স, ১৯২০ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে ইয়োরোপীয় রাজনীতির সর্বোচ শিখরে আরোহণ করে। কিন্তু ফ্রান্সের মিত্র রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ সমস্যায় বিব্রত থাকায়, তাদের সাহায্য নিতান্ত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অথচ মতাদর্শগত বিরোধের জন্য ফ্রান্স রুশমৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী ছিল না।

অন্যদিকে, ইতালিকে মুসোলিনির উত্থান ঘটায়, তিনিও ক্ষুদ্র আঁতাত ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। এইভাবে ১৯২৭ সালে যথাক্রমে ফ্রান্স, ইতালি ও রাশিয়ার নেতৃত্বে তিনটি পরস্পর বিরোধী শক্তিজোট গড়ে ওঠে।

ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি শেষপর্যন্ত যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আস্থা রাখতে না পারায় জাতিসংঘের ভূমিকা নিতান্ত অর্থহীন হয়ে পড়ে। ১৯৩১ সালে জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারার ফলে ভবিষ্যতে আগ্রাসী নীতির জয়যাত্রার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

২.৫ অনুশীলনী : প্রশ্নাবলি ও উত্তরসংকেত

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জেনেভা প্রটোকলের ভূমিকা কী ছিল? কেন এই প্রটোকলটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়?
উত্তর—অনুচ্ছেদ ২.২.২

২। কেলগ-ব্রিঁয়া প্যাক্ট যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় কতটা সফল হয়েছিল?—আলোচনা করুন।
উত্তর সংকেত—অনুচ্ছেদ ২.২.২

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের নিরাপত্তা প্রয়াস কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল? এই প্রয়াস কেন ব্যর্থ হয়ে যায়?
উত্তর—অনুচ্ছেদ ২.৩.১

কাজেই, ল্যাঙ্গাসামের ভাষায়, ১৯২৭ সালে, যুদ্ধবিরতির নয় বছর পর ইয়োরোপ পুনরায় বিবাদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে, প্রাক্‌বিশ্বযুদ্ধ দুটি শক্তিজোটের (Triple Entente, Triple Aliance) পরিবর্তে ফ্রান্স, ইতালি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে তিনটি জোটের সূচনা হয়।

অন্যদিকে লীগ চুক্তিপত্রের ১০ নম্বর এবং ১৬ নম্বর ধারার স্ববিরোধী ব্যাখ্যার ফলে এবং ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিতভাবে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আস্থা রাখতে না পারার ফলে ১৯৩১ সালে জাপান যখন মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করল, তখন চীনের শত আবেদন সত্ত্বেও লীগ কাউন্সিল জাপানকে আক্রমণকারী বলে চিহ্নিত করতে পারল না বা শাস্তি দিতে পারল না। জাপান জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করল। জাপান খোলাখুলিভাবে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করায় পরবর্তীকালে একনায়কতান্ত্রিক শক্তিগুলির আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। পৃথিবী সম্মুখীন হয়েছিল নতুন এক মারণ যজ্ঞের।

২.৪ সারাংশ

ইয়োরোপের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্যই ঊনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তিজোটে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই শক্তিজোট দুটি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইয়োরোপে শান্তি বিঘ্নিত হয়। প্রমাণিত হয়, শক্তিজোট গঠন নিরাপত্তা রক্ষার উপযুক্ত উপায় নয়।

বিধ্বংসী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিসের শান্তিচুক্তি প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা। শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল দুটি উপায়ে : একটি যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং অপরটি নিরস্ত্রীকরণ।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার তিনটি উপায় ছিল : জাতিসংঘের মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তা অর্জন, আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নিরাপত্তামূলক চুক্তি সম্পাদন এবং মৈত্রীজোট গড়ে তোলা।

প্রথমত, জাতিসংঘের মাধ্যমে সকল রাষ্ট্র মিলিতভাবে পারস্পরিক নিরাপত্তারক্ষার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে পারত। তবে, লীগের চুক্তিপত্রে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিহত করার কোনো নির্দিষ্ট পন্থা নির্দেশ করা হয়নি। জেনেভা প্রটোকলে চুক্তিপত্রের অন্তর্গত ১০ নম্বর এবং ১৬ নম্বর ধারার সংস্কার সাধন করে আক্রমণকারীকে চিহ্নিত করা এবং তার বিরুদ্ধে বিশেষ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

লীগের নেতৃত্বে যৌথ নিরাপত্তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হওয়ায় আঞ্চলিক স্তরে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আরম্ভ হয়। অর্থনৈতিক সমস্যা ও কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কায় দীর্ণ ফ্রান্স ক্রমেই জার্মানির সঙ্গে আঞ্চলিক ভিত্তিতে নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদনের গুরুত্ব অনুভব করে। অন্যদিকে, ১১৯২৩ সালে জার্মানির নবনিযুক্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী গুস্তাভ স্ট্রেসেসম্যান সূক্ষ্ম কূটনীতির মাধ্যমে পশ্চিম ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে জার্মানিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে সুইজারল্যান্ডের লোকার্নো শহরে ফ্রান্স, জার্মানি, ইংলন্ড, ইতালি এবং বেলজিয়াম একটি চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্স ও জার্মানির পারস্পরিক নিরাপত্তার দাবি স্বীকার করে নেয়। লোকার্নো চুক্তি সাময়িকভাবে আশার সঞ্চার করলেও নিরাপত্তা সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করতে পারেনি।

১৯২৮ সালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেলগ ও ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিঁয়ার নেতৃত্বে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ শক্তিগুলি প্যারিসে মিলিত হয়ে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় নীতিরূপে যুদ্ধের পথ বর্জন করে। যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে সূচিত হলেও প্যারিস চুক্তি নানান অসম্পূর্ণতার কারণে

সমঝোতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অথবা নিজস্ব মৈত্রী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের তথা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু যৌথ নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের সামূহিক প্রচেষ্টা বারে বারে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। এর বিপরীতে, ফ্রান্সের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা পূর্ব ইয়োরোপীয় শক্তি জোট যৌথ নিরাপত্তার বাতাবরণ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়, অথচ প্রাক্-যুদ্ধ সামরিক জোটের আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এই আদর্শ স্বাভাবিকভাবেই যৌথ নিরাপত্তার অনুকূল ছিল না। এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য শক্তিজোট গড়ে তোলার মানসিকতার জন্ম হয়।

১৯২২ সালে ৩৪টি দেশের প্রতিনিধি জেনোয়াতে ইয়োরোপের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোর জন্য এক সম্মেলনে মিলিত হন। তাঁরা খবর পেলেন ইতালির রাপালোতে জার্মানির ওয়াল্টার র‍্যাথেনাও এবং রাশিয়ার জর্জ চিচেরিন এক মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন।

স্বাভাবিক ভাবেই, এই দুটি শক্তি পরস্পরের নিকটবর্তী হয়। দুটি শক্তিই ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়। উভয়েই—মিত্রপক্ষীয় বা ফ্রান্স নিয়ন্ত্রিত বৈরীভাবাপন্ন শক্তিজোটের ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং উভয়েই নতুন বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপনে ব্যগ্র। জার্মানরা এই চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে আরও ব্যাপকতর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তারা আশা করেছিল, সোভিয়েত সমর্থনে তারা ভার্সাই ব্যবস্থাকে বাতিল করতে পারবে। অন্যদিকে রুশ নেতারা, এই চুক্তির মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ইয়োরোপীয় শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে, ঋণ পেতে এবং ফ্রাঙ্কো-পোল মৈত্রীর ভীতি দূর করতে চেয়েছিল। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে জার্মানি সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং উভয়ে প্রাক্-বিশ্বযুদ্ধ ঋণ ও অন্যান্য দাবী বাতিল করে দেয়। মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিরা এই চুক্তির সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সম্মেলন ভেঙে যায়।

রাপালোর চুক্তির অব্যবহিত পরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন রুশ বিরোধী ইয়োরোপীয় শক্তি জোট গড়ে ওঠার সম্ভাবনায় ভীত হয়ে ওঠে। রাশিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে আরম্ভ করে। ১৯২৫ সালে তুর্কি প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষর করে, কারণ উভয় শক্তিই পাশ্চাত্য শক্তিগুলিকে বিশ্বাস করত না।

১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের অপর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯২৬ সালের শেষে আফগানিস্তান ও লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯২৭ সালে পারস্যের সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তির আলোচনা শুরু হয়।

ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তার সন্ধানে শক্তিজোট গড়ে তোলার উৎসাহী হয়ে ওঠায় ইতালিও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চাইল না। যুদ্ধোত্তর যুগে পশ্চিম ভূমধ্যসাগর নিয়ন্ত্রণ করতে ফ্রান্স ও ইতালি দুজনেই আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। ফলত, উভয়পক্ষই সামরিক প্রস্তুতি, অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। তাছাড়া, ইতালির যুগোশ্লোভিয়ার অভিযোগ ছিল, ইয়োরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় তার অভিপ্রেত অঞ্চলগুলি ফ্রান্স অধিকার করেছে এবং ১৯১৯ সালে আরও বেশ উপনিবেশ লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

বেনিটো মুসোলিনি ক্ষমতায় আরোহণ করার পরেই ইতালিকে সুরক্ষিত করার জন্য মৈত্রী ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ১৯২৪ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লোভিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯২৬ সালে রুমানিয়া ও স্পেনের সঙ্গে চুক্তি হয়। ১৯২৬ সালে আলবানিয়ার সঙ্গে যথাক্রমে রাজনৈতিক চুক্তি ও প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি ও স্বাক্ষরিত হয়। ১৯২৭ সালে হাঙ্গেরির সঙ্গে চুক্তির কথাবার্তা চলতে থাকে।

রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। ১৯২০ সালে মার্শাল পিলসুদস্কি ইউক্রেন আক্রমণ করে রুশ ভূখণ্ড হস্তগত করেছিলেন। বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে রুমানিয়া বেসারাবিয়া নামক রুশ প্রদেশটি দখল করেছিল। যুগোশ্লোভিয়া অ্যাড্রিয়াটিকের উপকূল অঞ্চলে ইতালির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। টেশেনে (Teochen) পোল অধ্যুষিত কয়লাখনি অঞ্চলের অধিকার চেকোশ্লোভাকিয়ার হাতে চলে যায়। পোলান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এই মৈত্রী ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তুলেছিল। পূর্ব ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ গোলোযোগ ও বৈদেশিক সংঘাত এই অঞ্চলের রাজনৈতিক স্থিতিকে বিশেষভাবে বিঘ্নিত করেছিল। জার্মানি চুক্তির নির্মম শর্তগুলি ভঙ্গ করতে চাইলেই পূর্ব ইয়োরোপের অস্থিরতা তাকে সাহায্য করবে।

ফরাসি মৈত্রী ব্যবস্থার ভঙ্গুরতার জন্য কিছু কিছু ফরাসি পদাধিকারী ইতালির সঙ্গে পরিপূরক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু ফ্রান্সের যুদ্ধকালীন মিত্র ইতালি ইতিমধ্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। আল্‌প্স পর্বত অঞ্চলে এবং অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে ভৌমিক অধিকার বাড়াতে পারলেও ইতালীয় প্রতিনিধিরা ভার্সাই চুক্তি ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারেনি। এমনকি, ফিউম বন্দরটিও ১৯২৪ সালের পর ইতালির হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবুও তাদের অভিযোগের অবসান ঘটেনি। বিশেষত, অর্থনৈতিক সঙ্কট, সামাজিক সংঘাত এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে ইতালির জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তুলেছিল।

অধ্যাপক উইলিয়াম. আর. কেলর (William R. Keylor) প্রশ্ন তুলেছেন, ইংলন্ডের নিরুৎসাহ, পূর্ব ইয়োরোপীয় আঁতাতের দুর্বলতা এবং ইতালীয় প্রতিযোগিতায় বিপর্যস্ত ফ্রান্স কেন রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করেনি? প্রথমত, অক্টোবর বিপ্লবের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত প্রতিক্রিয়া মধ্য ইয়োরোপীয় সাম্যবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতার পরেও প্রশমিত হয়নি। ১৯১৯ মার্চ মাসে স্থাপিত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল (অথবা কমিনটার্ন) এবং ইয়োরোপের প্রায় প্রতিটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম, (এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি এই পার্টিগুলির বিশ্বস্ততা) ইয়োরোপের অভিজাত শাসকদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। ফ্রান্সে ১৯২০ দশকের গোড়ায় ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল মন্ত্রীসভা সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি বিশেষভাবে বিরূপ ছিল। রাশিয়ার যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ানো এবং বিপুল পরিমাণ ফরাসি ঋণ ফেরৎ দিতে অস্বীকার করার স্মৃতি তারা ভুলতে পারেনি। এই কারণেই ফ্রান্স, রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে (১৯১৮-২০) প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রধান সমর্থক হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালে ইউক্রেনে অনুপ্রবেশ করে তারা পোলদের নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করতে উৎসাহিত করে।

এছাড়া, রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানও জার্মানি বিরোধী শক্তি জোট গড়ে তোলার অনুকূল ছিল না। ফ্রান্স যে যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, রাশিয়া জাতীয় স্বার্থের কারণে সেই ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বিরোধী হয়ে উঠেছিল।

'২০-র দশকের শেষে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিরাপত্তার নামে ফ্রান্স ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল তার ভিত্তি সাময়িক শক্তি জোট। অথচ ১৯১৪ সালেই এই ধরনের শক্তিজোট প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত অকার্যকারিতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

২.৩.২ নিরাপত্তা প্রচেষ্টার ব্যর্থতা

'যৌথ নিরাপত্তা' প্রতিষ্ঠায় লীগের ব্যর্থতা প্রায় লীগের জন্ম মুহূর্তে থেকেই প্রকট হয়ে উঠেছিল। তবু যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার আশায় বারে বারে লীগের সদস্য রাষ্ট্রগুলি লীগের অধিবেশনের মাধ্যমে, আঞ্চলিক

কাজ করবে। সব মিলিয়ে, তাঁরা জার্মানিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ফরাসি প্রত্যাশার কেন্দ্রে ছিল চেকোশ্লোভাকিয়া। জার্মানির প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র চেকোশ্লোভাকিয়াই শিল্পগত ও সামরিক শক্তির দিক থেকে জার্মানিতে প্রতিহত করার উপযুক্ত ছিল। পশ্চিম চেকোশ্লোভাকিয়াতে প্রায় তিন লক্ষ জার্মান অধিবাসী ছিল। জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে জার্মানি এদের ক্ষুব্ধ করে তুলতে চেয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রাগের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ফরাসি মিত্রতার আহ্বানে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯২৪ সালে ২৫ জানুয়ারি, দুটি দেশ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। অকারণে আক্রান্ত হলে দুটি দেশ পরস্পরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৯২৬ সালের ১০ জুন ফ্রান্স ও রুমানিয়ার ১১ নভেম্বর, ১৯২৭ ফ্রান্স ও যুগোশ্লোভিয়া পারস্পরিক মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। রুশ মৈত্রীর বিকল্প হিসেবে ফ্রান্স ইয়োরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য কয়েকটি মিত্র রাষ্ট্রের বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে ধরে জার্মানিকে। ফ্রান্স সরকারি ও বেসরকারী সামরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে পোলান্ডের মতো অনুরূপ ব্যবস্থা অনুসারে ক্ষুদ্র আঁতাতভুক্ত দেশগুলির সৈন্যবাহিনীকে রণসম্ভার সরবরাহ করে ও ফরাসি সামরিক মিশন পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়। চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লোভিয়া বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জেনিভা ও অন্যত্র ফ্রান্সের বিশ্বস্ত অনুগামী রাষ্ট্রের ভূমিকা নেয়। তবে ক্ষুদ্র আঁতাতের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্ক এবং পোলান্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্কের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। জার্মানিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ফ্রান্স ও পোলান্ড মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে ভার্সাই নির্ধারিত রাইন নদীর পাড়ে আটকে রাখে।

পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র আঁতাতের সঙ্গে ফ্রান্সের সমঝোতা হয় পরোক্ষভাবে, তার নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য। ক্ষুদ্র আঁতাতের তিনটি সদস্য রাষ্ট্র ভার্সাই সন্ধি কার্যকর করতে ফ্রান্সকে সাহায্য করবে, যদিও এ ব্যাপারে তাদের নিজস্ব স্বার্থ ছিল নগণ্য। ফ্রান্স সামগ্রিকভাবে ক্ষুদ্র আঁতাতকে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ও যুগোশ্লোভিয়াকে বিশেষ করে ইতালির বিরুদ্ধে সাহায্য করবে। এর ফলে নিরাপত্তা সম্পর্কে ফ্রান্সের নিজস্ব ধারণার পরিমণ্ডল ব্যাপকতর হল। ফ্রান্স, শুধু ভার্সাই সন্ধির নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাইন নদীর পারে আটকে রাখা এবং পূর্বাঞ্চলে তার শক্তিবিস্তার প্রতিহত করাই ফ্রান্সের একমাত্র লক্ষ্য রইল না। ফ্রান্সের দায়িত্ব হল লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে পোলান্ডকে, হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়াকে এবং বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুগোশ্লোভিয়া ও রুমানিয়াকে সমর্থন করা। এমন কি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতি তাদের দায়দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও ফ্রান্স তার মিত্র রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করেছিল। ফলে, ফ্রান্স, এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অভিভাবকরূপে তার যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল।

অধ্যাপক ই. এইচ. কারের মতে প্রচুর রণসম্ভার এবং এক বিশাল বিজয়ী সেনাবাহিনীতে সুসজ্জিত ফ্রান্স, ১৯২০ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে ইয়োরোপীয় রাজনীতির সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। ফ্রান্স ছিল স্থিতাবস্থার সমর্থক ও সংশোধনবাদের ঘোরতর শত্রু। ১৮১৫ সালের পরবর্তীকালের মেটারনিখ যেমন ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন, তেমন ফ্রান্সও যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল।

কাগজে কলমে এই মৈত্রী ব্যবস্থা অত্যন্ত পরাক্রমশালী বলে প্রতীয়মান হলেও কার্যত, পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে ফ্রান্সের এই মৈত্রী ব্যবস্থার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা ছিল। তাই এই মৈত্রী ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ইয়োরোপে শান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ফ্রান্সের মিত্র রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটিই ছিল বহুজাতিক রাষ্ট্র। সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ক্ষোভ ও হতাশা রাজনৈতিক ঐক্য ও সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। এর চেয়েও বড় সমস্যা হল, প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই বিভিন্ন ভূখণ্ডের দখলদারী নিয়ে হয় নিজেদের মধ্যে নয় জার্মানি ছাড়া অন্যান্য বিদেশি

যখন ফ্রান্স দেখল, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার 'প্রাকৃতিক নিরাপত্তা' (Physical Guarantee) রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত নয় তখন সে দুটি বিকল্প পথ অবলম্বন করে : সন্ধির মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ ও মৈত্রী চুক্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

বিমূর্ত নিরাপত্তাসূচক চুক্তির পরিবর্তে সামরিক চুক্তি সম্পাদনই ফরাসি ঐতিহ্যের অনুকূল ছিল। এই নীতি অনুসারে অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে অস্ট্রিয়াকে পরিবেষ্টিত করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ফ্রান্স ইংলন্ড ও রাশিয়ার সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলে জার্মানিকে বেষ্টন করেছিল। যুদ্ধোত্তর পর্বে ফ্রান্স পুনরায় নিরাপত্তা অর্জনের নামে জার্মানিকে মিত্র রাষ্ট্রগুলি দ্বারা বেষ্টন করতে চাইল।

এছাড়া জাতিসংঘের সনদের অনুমোদন ছাড়া জার্মানির বিরুদ্ধে নিজেকে সুরক্ষিত করার কোনও উপায় ফ্রান্সের ছিল না। তাই ইউরোপের যে দেশগুলি ভার্সাই চুক্তির ভৌমিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় তাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে ফ্রান্স আগ্রহী হয়ে ওঠে।

১৯২০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ফ্রান্স বেলজিয়ামের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে। বেলজিয়াম জার্মানির কাছ থেকে ইউপেন ও মামেডি লাভ করায় ভবিষ্যতে জার্মান আক্রমণের দ্বারমুখ হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘকাল, নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে বেলজিয়াম নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। কাজেই নিজের স্বার্থেই বেলজিয়াম ভার্সাই চুক্তির শর্তগুলি বজায় রাখার জন্য ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

এরপর জার্মানির পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত পোলান্ডের দিকে মিত্রতার হাত প্রসারিত করে ফ্রান্স। জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া থেকে রাজ্যাংশ নিয়ে ১৯১৮ সালের ৩ নভেম্বর আধুনিক পোলান্ডের জন্ম। পোলান্ড ডানজিগ বন্দরে অর্থনৈতিক অধিকার এবং উত্তর সাইলেশিয়া লাভ করায় জার্মানি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ক্ষুব্ধ জার্মানি ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোলান্ড ফ্রান্সের সামরিক সুরক্ষা প্রার্থনা করেছিল। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফরাসি-পোল মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর সঙ্গে একটি গোপন সামরিক চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছিল। পোলান্ডকে জাতীয় পুনর্গঠন এবং অস্ত্রনির্মাণের জন্য ফ্রান্স প্রভূত অর্থ দিয়েছিল। কয়েকজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ফরাসি কূটনৈতিক অনুযোগ করেছিলেন, এই কোন্দলপরায়ণ মিত্র, ফ্রান্সের সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে উঠবে। তাছাড়া, ফরাসি সৈনিকরাও পোলান্ডের জন্য প্রাণ দিতে রাজি হবে না। পোলান্ডের অধিবাসীরাও ফরাসি সহযোগীদের দাম্ভিকতা এবং ফরাসি সামরিক দৌত্যের ব্যয়ভারে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তবে, এই সব ছোটখাট মত পার্থক্য এই সুদৃঢ় মৈত্রীকে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি। আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ফ্রান্স ও পোলান্ডের অবস্থান ছিল পাশাপাশি। জেনেভাতে ফরাসি ও পোল প্রতিনিধিরা প্রতিটি প্রকাশ্য বিতর্কে একত্রে অংশগ্রহণ ও ভোটদান করতেন।

ড্যানিয়ুব অঞ্চলে হাঙ্গেরি রাজ্য ভেঙে চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লোভিয়া রাজ্য গড়ে উঠেছিল—সম্ভাব্য হাঙ্গেরীয় আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এই রাজ্যগুলি নিজেদের মধ্যে ১৯২০-২১ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত করে। চেকোশ্লোভাকিয়া মূলত মধ্য ইয়োরোপের এবং রুমানিয়া বলকান অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুগোশ্লোভিয়া এই দুটি অঞ্চলের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। উত্তরে যুগোশ্লোভিয়ার সীমান্ত ভিয়েনার একশত মাইলের মধ্যে এবং দক্ষিণপূর্ব ইজিয়ানের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। তবে যুগোশ্লোভিয়ার কাছে হাঙ্গেরি প্রধান উদ্বেগের কারণ ছিল না। চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়ার তুলনায় যুগোশ্লোভিয়া হাঙ্গেরির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশ পেয়েছিল। অন্যদিকে এড্রিয়াটিক সমুদ্রে ইতালির প্রতিপত্তি যুগোশ্লোভিয়াকে গভীরভাবে ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল। এই তিনটি রাষ্ট্রের মৈত্রীকে ক্ষুদ্র আঁতাত (Little Entente) বলা হয়ে থাকে। ফরাসি কূটনৈতিকরা সচেতনভাবে এই তিন রাষ্ট্রের সঙ্গে এবং পোলান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের আশা ছিল এই চারটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র-জার্মান শক্তির প্রতিপক্ষ রূপে রাশিয়ার বিকল্প হিসেবে

অনুপাতের উন্নতি হয়নি। যুদ্ধের আগেই ফ্রান্সের জন্মহার হ্রাস পেয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ১.৪ মিলিয়ন সম্ভাব্য পিতার মৃত্যু ফরাসি জন্মহারের অবক্ষয় আরও তীব্র করে তুলেছিল। অনতিবিলম্বে জার্মান জনসংখ্যা ফরাসিদের দ্বিগুণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। যখন ৩০'-এর দশকের মাঝামাঝি জার্মানি ইয়োরোপে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে তখন সামরিক পরিষেবা দেবার মতো জনসংখ্যা ফ্রান্সে থাকবে না।

জার্মানিতে সামরিক পুনরুজ্জীবন ঘটলে কীভাবে তার মোকাবিলা করা যাবে তা নিয়ে ফরাসি কূটনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ফরাসি পররাষ্ট্রনীতির পূর্বতন ঐতিহ্য অনুসারে জার্মানিকে বিভক্ত এবং দুর্বল করে রাখাই ফরাসি নিরাপত্তারক্ষার প্রধান উপায় বলে মনে করা হয়। কিন্তু, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার উইলসনীয় 'কূটনীতির নতুন পন্থা' ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছিল। মার্কিন প্রতিনিধিদের বিরোধিতার আশঙ্কাতেই শেষ পর্যন্ত ক্লেমেসোঁ জার্মানির প্রতি লঘুতর শান্তির প্রস্তাব পেশ করেছিল।

ক্লেমেসোঁর, উদ্দেশ্য ছিল ফরাসি সীমান্ত ও রাইন নদীর মধ্যবর্তী ভৌগোলিক ও সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাইনল্যান্ডের নিরাপত্তা বিধান করা। তাঁর প্রস্তাব ছিল রাইনল্যান্ডকে জার্মানি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফরাসি সামরিক রক্ষণাধীন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে গঠন করা। ফ্রান্সের পক্ষে রাইনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রয়োজনীয়।

ইঙ্গ মার্কিন পক্ষের চাপে, উইলসন প্যারিস ত্যাগ করার হুমকি দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত ফরাসিপক্ষ একটি আপোষ মীমাংসা মেনে নেয়। ফ্রান্স রাইনল্যান্ডে জার্মান রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়ায়, আমেরিকা ও ইংলন্ড কতকগুলি রক্ষণাত্মক প্রতিশ্রুতি (guarantee) দেয় : (১) রাইন নদীর পশ্চিম তীরে এবং পূর্ব তীরে পঞ্চাশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ অঞ্চলে জার্মান সামরিক বাহিনী সমাবেশ করা অথবা দুর্গ নির্মাণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়, (২) ১৫ বছরের জন্য রাইনল্যান্ডে মিত্রপক্ষীয় সৈন্য মোতায়েন করা হয়। (৩) সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে রক্ষা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলন্ড অভূতপূর্ব সামরিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

১৯২০-র দশকের প্রথমার্ধে ফ্রান্সের বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষ গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে অসম্পাদিত চুক্তিটিকে পুনরুত্থিত করতে চায়। মার্কিন সেনেটের অনুমোদনের অভাবে এই চুক্তিটি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছিল। ইংলন্ড একাকী ফ্রান্সের সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। অপ্রত্যাশিত জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে রক্ষা করায় ইংলন্ডের আইনগত আপত্তি ছিল। ফ্রান্স ও জার্মানির সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব স্বীকার করা ইংলন্ডের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে বা জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে অপরিহার্য ছিল না।

ইয়োরোপে শক্তিসাম্য বজায় রাখার প্রাচীন নীতি অনুসারে লন্ডন কোনো ইয়োরোপীয় শক্তিকেই অত্যধিক সামরিক ক্ষমতা অর্জনে উৎসাহিত করতে চায়নি। জার্মানির তুলনায় ফ্রান্স অধিক শক্তি সংগ্রহ করতে চাইলেও ইংলন্ড তার পুরোপুরি বিরোধিতা করে। ১৯২০ সালে ফ্রান্সের স্থলবাহিনী ও বিমান বাহিনী পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অপ্রতিরোধ্য ছিল। ফরাসি বিমানবাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব সীমান্তে সুরক্ষিত করা। ইংলণ্ড তার যুদ্ধকালীন বিমানবহর ভেঙে ফেলায় ফরাসি বিমান শক্তিতে আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

ইংলন্ডের কূটনৈতিকরা জার্মানির বিক্ষোভের কারণগুলি দূর করে জার্মানিকে একটি সহযোগী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। তাদের ধারণ ছিল এতেই ইয়োরোপের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে। অথচ, ফ্রান্সের মতে সবচেয়ে জনবহুল এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রসর শক্তি হিসেবে জার্মানি যে কোনো মুহূর্তে ইয়োরোপের তথা ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে।

২.৩.১ নিরাপত্তার সন্ধানে ফ্রান্স

১৯১৯ সালের পর ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিধানের দাবী। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স ছিল ইয়োরোপের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সামরিক শক্তি। নেপোলিয়নের সময় পর্যন্ত ফ্রান্সের অপ্রতিহত সামরিক গৌরব অব্যাহত ছিল। কিন্তু নেপোলিয়ন শেষ পর্যন্ত ইয়োরোপীয় শক্তিজোটের কাছে পরাস্ত হন। নব উত্থিত প্রাশিয়ার কাছে ১৮৭০ সালের পরাজয় ফ্রান্সের মোহভঙ্গ ঘটায়। ১৮৭১ সালের পর বিজয়ী জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্স বহু চেষ্টায় পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে এনেছিল।

১৯১৪ সালে ফরাসিরা অনুভব করেছিল ব্রিটিশ শক্তির দ্রুত হস্তক্ষেপ ছাড়া ছয় সপ্তাহের মধ্যে তারা পুনরায় একটি পরাজিত শক্তিতে পরিণত হত। ১৯১৮ সালের বিজয়ের আনন্দ ছিল নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী—আনন্দোৎসবের অন্তরালে এক গভীর দুশ্চিন্তার ছায়া পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। ১৯১৮ সালের শরৎকালে কুলস কাঁবঁ (Cambon), বার্লিনের পূর্বতন ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে সাবধান করে দিয়েছিল। ['France victorious must grow accustomed to being a lesser power than France vanquished.'] জয়ী ফ্রান্স পরাজিত ফ্রান্সের তুলনায় একটি ক্ষুদ্রতর শক্তি'—এ বিষয় ফ্রান্সকে অভ্যস্থ হত হবে। এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র ইয়োরোপে জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্যের উল্লেখ করা হয়নি, আতলান্তিক সাগরের পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির উল্লেখও করা হয়েছিল। ১৯২০ সালে সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেমাজিঁও (Demangeon) *Le Dcline de*.। *Europe* গ্রন্থে আলোচনা করেন কীভাবে যুদ্ধোত্তর বিশ্বের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল ইয়োরোপ থেকে আমেরিকায় সরে যাবে। অর্থাৎ ফ্রান্সের আর্থিক অবনতি ঘটবে।

বিজয়ী ফ্রান্সের সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। উত্তরপূর্ব ফ্রান্সের ১০টি প্রদেশ (departments) যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অপসৃয়মান পরাজিত জার্মান বাহিনী ফ্রান্সের মাটি ছেড়ে যাবার আগে শ্মশানে করে দিয়ে গিয়েছিল। কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, অর্থনৈতিকভাবে ফ্রান্সকে বিপর্যস্ত করার জন্যই তারা এই ধ্বংসলীলা চালায়। কয়লাখনিতে জল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, রেলপথ ও টেলিগ্রাফ লাইন উপড়ে ফেলা হয়। কৃষিক্ষেত্রে শেলেরে আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, এলোমেলোভাবে কাটা ট্রেঞ্চ জমিগুলিকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। গবাদি পশু হত্যা করে বাসগৃহ পুড়িয়ে ফেলে জার্মানরা পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। উত্তরপূর্বে ফ্রান্সে শিল্প-কারখানা, কর্ষণযোগ্য ভূমি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং শ্রমিকের অভাব ফ্রান্সের উৎপাদনের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। এছাড়াও, যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য বিদেশে নিযুক্ত পুঁজি তুলে আনতে হয়েছিল। বিদেশি রাষ্ট্রগুলির কাছে বিপুল ঋণ হয়েছিল এবং রাশিয়া, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও তুরস্কতে বিপুল প্রাক্-যুদ্ধ বিনিয়োগ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় ফরাসি অর্থনীতি ধ্বংসের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলির পুনর্গঠন এবং লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু, বিধবা, অনাথ এবং পঙ্গু প্রাক্তন সৈনিকদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন করতে গেলে, বিদেশি ঋণ শোধ করতে গেলে অর্থনীতিকে যেভাবে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হত, তা ফ্রান্সের একক প্রচেষ্টায় করে তোলা ছিল অসম্ভব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফ্রান্সের জনসংখ্যাগত দুর্বলতা এবং ভৌগোলিক অবস্থানগত দুর্বলতা (Vulnerability) প্রকট হয়ে উঠেছিল। বিশাল নদী এবং উত্তুঙ্গ পর্বত জার্মান সীমান্তের প্রাকৃতিক প্রহরী। পূর্বদিকে রুশ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ায় জার্মান শক্তির পূর্ব সীমান্ত রাজনৈতিকভাবে সুরক্ষিত হয়ে পড়েছিল। ফ্রান্স ও জার্মানির জনসংখ্যা ও জন্মহারের তুলনামূলক তারতম্য ফ্রান্সকে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। ৩৯ মিলিয়ন ফরাসির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ৬৩ মিলিয়ন জার্মান, আলশাস লোরেনের ২ মিলিয়ন বাসিন্দা ফ্রান্সের অধীনে এলেও জনসংখ্যাগত

প্যারিস চুক্তির উৎসাহব্যঞ্জক অনুমোদন জাতিসংঘের যৌক্তিক অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। লীগের চুক্তিপত্রে জাতীয় নীতির হাতিয়ার রূপে যুদ্ধের ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়নি। কোনো সদস্য কি অবস্থায় বৈধ যুদ্ধের পথে কতদূর অগ্রসর হতে পারবে, তার সীমা সঙ্কুচিত করাই ছিল জাতিসংঘের রচয়িতাদের লক্ষ্য। প্যারিসের চুক্তির মাধ্যমে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলি আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য কোনো কারণে যুদ্ধের পথ অনুসরণ না করার অঙ্গীকার করে। এই নুতন দায়বদ্ধতা চুক্তিপত্রের অঙ্গীভূত করে চুক্তিপত্রকে আরও শক্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা ও ব্যাপারে অনেকগুলি প্রস্তাব আনেন।

বিষয়টি কার্যকর করা যতটা সহজ মনে হয়েছিল, ততটা সহজ ছিল না। প্যারিস চুক্তি ছিল একটি যুদ্ধবিরোধী নৈতিক ঘোষণা, অথচ চুক্তিপত্রটি ছিল একটি রাজনৈতিক চুক্তি। প্যারিস চুক্তি সকল প্রকার যুদ্ধের নিন্দা করেছিল, কিন্তু কোনো শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেননি। অন্যদিকে চুক্তিপত্রটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুদ্ধ মেনে নিয়েছিল এবং অন্যগুলিকে নিষিদ্ধ করেছিল ; এবং নিষিদ্ধ যুদ্ধগুলির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এই দুই ভিন্নধর্মী ব্যবস্থাকে সংযুক্ত করা এবং কার্যকর করা ছিল অত্যন্ত দুঃসাধ্য। লীগের চুক্তিপত্রে, প্যারিস চুক্তির শর্তগুলি সংযোজিত করলে, এক ক্ষেত্রে যুদ্ধকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ আবার অন্য ক্ষেত্রে তা অনুমোদন করতে হ'ত। অর্থাৎ যুদ্ধ নিষিদ্ধ হলেও, মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে তা শাস্তি যোগ্য হত। এই নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়ত এবং অবলীলায় চুক্তিপত্রের কিছু অংশ লঙ্ঘন করা সম্ভব হত। জাপান ও ইতালি অনতিবিলম্বে এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে শুরু করেছিল, একজন পুলিশী তৎপরতার সূক্ষ্ম ছদ্মবেশে, অন্যজন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অজুহাতে।

আক্রমণ ঘটলে একটিমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা রইল ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ ব্যবহার করে, কেবলমাত্র জাতিসংঘ উল্লিখিত নিষিদ্ধ যুদ্ধগুলি নয়, প্যারিসের চুক্তিতে যে সব যুদ্ধকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেইসব ক্ষেত্রেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এইভাবে একই সঙ্গে চুক্তিপত্রকে জোরদার করা এবং প্যারিস চুক্তির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হত। ১৯২৯ সালে এই ধরনের প্রস্তাব ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা করেছিল। ফরাসি প্রতিনিধিরা তা আন্তরিকভাবে সমর্থন করে। কিন্তু এ ব্যাপারে, একটি আশঙ্কা থেকেই গেল। ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদের সম্প্রসারণ করলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব বেড়ে যেত।

হয়ত, ১৯২৯ সালে পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলি যৌথ নিরাপত্তার কারণে এই প্রস্তাব মেনে নিত। কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনা ১৯৩০ সালের সংসদীয় অধিবেশন পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হয়। এই অবকাশে নানা সংশয়ের উদয় হয়। জাপান ও স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলির কাছ থেকে এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা আসে। এই আপত্তি সত্ত্বেও, সংশোধনগুলির গৃহীত হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু গৃহীত সংশোধনগুলির চূড়ান্ত অনুমোদন করা যেত কিনা সন্দেহ। যাই হোক, পরবর্তী সংসদের বিবেচনার জন্য সংশোধনী প্রস্তাবটিকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ গ্রেট ব্রিটেন এক গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটে ডুবে যায় এবং সেখানকার সরকার পাল্টে যায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি চাপা পড়ে যায়।

এইভাবে জাতিসংঘের মাধ্যমে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পথে শেষে পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়ে যায়। এই প্রচেষ্টার শুরু ১৯২২ সালে। জেনেভা প্রটোকল বানচাল হয়ে যাবার পর ১৯২৭ সালে পুনরায় এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৯৩০ সালের সংসদীয় অধিবেশনের পর দ্রুত মেঘ জমতে থাকে। ১৯৩১ সালের গ্রীষ্মকালে ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার নিরাপত্তা বিষয়ক সাধারণ আইন (General Act) অনুমোদন করলেও, এবং যুদ্ধ প্রতিরোধের উপায় সংক্রান্ত কম গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন গৃহীত হলেও এগুলি আগেকার উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে পারেনি।

অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অথচ এই ঘোষণায় কোনো নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতিদানের বাধ্য বাধকতা ছিল না। এর আগেও, ক্লেমেসোঁ চেয়েছিলেন জার্মানিকে শান্তিচুক্তির শর্তগুলি মানতে বাধ্য করা হোক। অথচ উইলসন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সার্বজনীন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। ব্রিঁয়াকেও ফ্রান্স ও আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পরিবর্তে বহুদেশীয়, যুদ্ধবর্জন সংক্রান্ত ঘোষণা মেনে নিতে হয়। এই ঘোষণায় কোনো নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ অথবা অন্য বাধ্যবাধকতা ছিল না।

১৯২৮ সালের ২৭ আগস্ট ছয়টি বৃহৎ শক্তির প্রতিনিধিরা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও জাপান) তিনটি লোকার্নো চুক্তিভুক্ত দেশ (বেলজিয়াম,. পোলান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া) এবং ব্রিটিশ স্বশাসিত উপনিবেশগুলি ও ভারত প্যারিসে মিলিত হয়ে চুক্তিটি স্বাক্ষর করে। বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রকেও এই চুক্তিতে যোগ দেবার আহ্বান জানান হয়। কেবলমাত্র, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, সৌদি আরব ও ইয়েমেন এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে 'পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি রূপে যুদ্ধ বর্জন'-এর প্রতিশ্রুতির তাৎপর্য সম্পর্কে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে পত্রালাপ হয়েছিল। কার্যত, এই চুক্তির দ্বারা আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধঘোষণা নিষিদ্ধ হয়নি। আবার, কোনো পরিস্থিতিতেই প্রতিরোধ না করার চূড়ান্ত শান্তিকামী নীতিও এটি ছিল না। গ্রেট ব্রিটেন, তার আত্মরক্ষার অধিকারের সঙ্গে বিশ্বের কয়েকটি অঞ্চলের নিরাপত্তাকে যুক্ত করেছিল। কারণ, তার শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে আলোচ্য অঞ্চলগুলির ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মরক্ষার অর্থ *মনরো নীতি লঙ্ঘিত হলে তার প্রতিকার করা। এই নানাধরনের ব্যাখ্যার ফলে চুক্তিটির সার্বজনীন চরিত্র বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। অনেকেই এই চুক্তিটিকে নিতান্ত নীতিগত ঘোষণা বলে মনে করেছিলেন, চুক্তিগত দায়বদ্ধতা স্বীকার করেননি। প্রতিটি রাষ্ট্র নিজেই, নিজের কাজের একমাত্র বিচারক ছিল। চুক্তিটির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের উপযুক্ত কোনো সংস্থা স্থাপিত হয়নি।

নানাদিক থেকে অসম্পূর্ণ হলেও যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্যারিস চুক্তি ছিল এক বিরাট পদক্ষেপ। ইতিহাসে এটিই ছিল প্রায় সার্বজনীন রাজনৈতিক চুক্তি। মনরো নীতি উল্লেখিত হওয়ায় আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের মতো দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলি ক্ষুব্ধ হয়ে দূরে সরেছিল। এই সামান্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রায় ৬৫টি দেশ এই চুক্তি অনুমোদন করেছিল।

লীগের সদস্য সংখ্যার চেয়ে এই সংখ্যাটি ছিল সাতজন বেশি। এমনকি, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমে ইতস্তত করলেও পরে এত উৎসাহিত হয়ে পড়ে যে, পারিস চুক্তি সাধারণভাবে স্বীকৃত হবার আগেই তারা প্রতিবেশীদের সঙ্গে এটি কার্যকর করার জন্য একটি আলাদা চুক্তি প্রস্তাব করে এবং তা সম্পাদন করে। এই চুক্তির কার্যকারিতায় পুরোপুরি আস্থাশীল না হয়েও, অনেক রাষ্ট্র মতৈক্যে আসার জন্যই এতে যোগ দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধকে বেআইনী (Outlawry of war) ঘোষণা করেছিল। অর্থাৎ একটি বিশ্বজননী অলিখিত বিধানের দ্বারা যুদ্ধকে দোষণীয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই আইন লঙ্ঘনের শাস্তি দেবার বা আইন লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা তা স্থির করার কোনো দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ ছিল না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিশ্বের রাজনৈতিক চেতনায় এই মূল্যবোধ গভীর রেখাপাত করেছিল।

---

* মনরো নীতি : মার্কিন মহাদেশে অপর কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করার নীতি। ১৮২৩ সালে প্রেসিডেন্ট মনরো এই নীতি প্রবর্তন করেন। (*America for the Americans*)

অনেক বেশি কার্যকর। এই আদর্শ চুক্তিগুলি যুগ্মভাবে দুটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট কর্তৃক গৃহীত হতে পারে। প্রাগ্রসর রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে সালিশি চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলি আইনগত বিরোধগুলি সালিশিতে পাঠাতে পারে। যারা বাধ্যতামূলক সালিশি মানতে প্রস্তুত নয় তারা অন্য কোনো পদ্ধতি মেনে নিতে পারে। ১৯২৮ সালে এ-ধরনের প্রায় দশটি আদর্শ চুক্তির খসড়া পেশ হয়।

আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসার জন্য তিনটি অধ্যায় রচিত হয়। প্রথম অধ্যায় বলা হয় প্রত্যেকে যুগ্ম স্বাক্ষরকারী একটি স্থায়ী মীমাংসা কমিটি গঠন করবে, এই কমিশন পারস্পরিক বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণযোগ্য সূত্র সুপারিশ করবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সব আইনগত বিবাদ আন্তর্জাতিক আদালতের সামনে পেশ করার প্রস্তাব করা হয়। এই আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক। তৃতীয় অধ্যায়ে আইন বহির্ভুত বিবাদগুলি একটি সালিশি কমিটিতে পাঠাতে বলা হয়। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র এক বা একাধিক অধ্যায় মেনে নিতে পারবে। এমন কি, তারা ইচ্ছে করলে কোনো বিশেষ ধরনের বিবাদকে এর আওতার বাইরে রাখতে পারে।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত সব রকমের সমস্যা মেটানোর পক্ষে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট নমনীয় হলেও আইনটির উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঘটেনি। প্রথম অধ্যায়ের প্রস্তাব নতুন কিছু ছিল না। এর আগেই লোকার্ন চুক্তি ও অন্যান্য চুক্তিটি মীমাংসা কমিশন গঠনের প্রস্তাব ছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বক্তব্যতেও নতুন কিছু ছিল না। তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্যভাবে লীগ কাউন্সিলকে বাদ দিয়ে কাজ করার কথা চিন্তা করা হয়। ১৯২৮ সালের মধ্যে কেবলমাত্র বেলজিয়াম, নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং ফিনল্যান্ড এই অধ্যায়গুলি মেনে নেয়। হল্যান্ড ও সুইডেন শুধু প্রথম দুটি অধ্যায় মেনে নেয়।

(লোকার্নো চুক্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে পাবেন।)

২.২.২ প্যারিসের চুক্তি (কেলগ ব্রিঁয়া প্যাক্ট ১৯২৮)

লোকার্নো চুক্তির পরেও ব্রিঁয়া ফরাসি-জার্মান দ্বিপাক্ষিক মৈত্রীকে (detente) শক্তিশালী করে তোলার জন্য অন্যান্য শক্তির সাহায্য ও সমর্থন পাবার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ, ইয়োরোপের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে দ্বি-পাক্ষিক মৈত্রীর গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য। ১৯২৭ সালের ৬ই এপ্রিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের দশ বছর পূর্তিসূচক অনুষ্ঠানে মার্কিন জনগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে ফরাসি বিদেশ মন্ত্রী যুদ্ধের পথ পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে দুই দেশের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তির প্রস্তাব করেন। ব্রিঁয়া আশা করেছিলেন এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপে ফ্রান্সের নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করে তুলবে। কিন্তু, এ সময়ে ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাতের কোনো ক্ষীণ সম্ভাবনাও ছিল না। কাজেই মার্কিন রাষ্ট্রসচিব ফ্রাঙ্ক কেলগ এই প্রস্তাবকে নিতান্ত শীতলভাবে গ্রহণ করেন। প্যারিসে উইলসন প্রস্তাবিত ভেঙে যাওয়া ফরাসি-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার কোনো ইচ্ছা কেলগের ছিল না। কিন্তু শান্তিকামী মার্কিন জনমত ব্রিঁয়ার এই প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের সুযোগ খুঁজে পেয়েছিলেন। এই জনমতের চাপে পড়ে কেলগকে শেষ পর্যন্ত ফরাসি আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কেলগ প্যারিসে একটি শান্তি প্রস্তাব পাঠান। এই প্রস্তাবে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিটিকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক ঘোষণায় পরিণত করার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়।

সন্ত্রস্ত ফরাসি কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা হল এই চুক্তি লোকার্নোর মতো আঞ্চলিক চুক্তির যৌক্তিকতা নাকচ করে দেবে। কারণ লোকার্নোতে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপের

রক্ষায় বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিল না। তৃতীয়ত, জার্মানির পশ্চিম সীমান্তকে অলঙ্ঘনীয় বলে মনে নিলেও ব্রিঁয়া বা চেম্বারলেন জার্মানির কাছ থেকে পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করেন নি। জার্মান বিদেশমন্ত্রী পোলান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে জার্মানির সীমানাকে অপরিবর্তনীয় বলে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অর্থাৎ, জার্মানি ভবিষ্যতে পূর্ব সীমান্ত লঙ্ঘন করার পথ উন্মুক্ত রেখেছিল। চতুর্থত, চেকোশ্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেনি বলে, তাদের গভীর আশঙ্কা হয় যে তাদের স্বার্থহানির বিনিময়ে পশ্চিমি দেশগুলি জার্মানির সঙ্গে আপোষ-রফা করে নিচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রমাণ হয় যে, স্বেচ্ছায় দায়িত্ব স্বীকার না করলে ভার্সাই চুক্তি কার্যকর করা সম্ভব হবে না।

বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার সুযোগে জার্মানি ভার্সাই চুক্তি অন্তর্গত নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত ধারা পালনের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি। এই সময় জার্মানিকে তোষণ করার জন্য ইংলন্ড ও ফ্রান্স জার্মানিকে বহু সুযোগ দিয়েছিল।

ফরাসি মন্ত্রী ব্রিঁয়া ফরাসি-জার্মান সীমান্তরক্ষা সম্পর্কে ইংলন্ডের নজরদারির প্রতিশ্রুতি অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি নিতান্ত অর্থহীন হয়ে পড়ে। তবে, ইংলন্ড নিরপেক্ষ জামিনদার (guarantor) হিসাবে কোনো পক্ষকেই সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহিত করেনি।

লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরই জার্মানি লীগের সদস্যপদ লাভ করে। জার্মানি এবং অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনী কুচকাওয়াজে ব্যস্ত নয়, আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণশোধ শুরু হয়েছে, উৎপাদনের পরিমাণ এবং চাকরি পাবার অনুপাত প্রায় প্রাক্-বিশ্বযুদ্ধ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিস্থিতে জার্মানিকে জয়ী মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিদের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে ব্রিঁয়া মন্তব্য করেছিলেন, 'আজ থেকে নারীরা উদ্বেগমুক্ত হৃদয়ে ছোট শিশুদের দিকে তাকাতে পারবেন।' ("From this day forth women will be able to fix their eyes to little children without feeling their hearts torn by anxiety.")

ব্রিঁয়া যে লোকার্নো চেতনায় আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ হননি, তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপ থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবলব্ধ ফরাসি-জার্মান নৈকট্যের নীতির পরিপূরকরূপে ব্রিঁয়া ফ্রান্সের কূটনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করেন। তিনি অনুমান করেছিলেন, একদিন না একদিন স্টেসেম্যানের সমঝোতা নীতি পরিত্যক্ত হবে। এ ব্যাপারে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বামপন্থীদের কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থীদের প্রতিক্রিয়ায় প্রভাব-বিস্তার করেছিল।

লোকার্নো চুক্তির পরেও লীগ নিরাপত্তা স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে বহু নতুন প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। ১৯২৬ সালে ফিনল্যান্ডের প্রতিনিধিরা প্রস্তাব করে আক্রান্ত রাষ্ট্রকে লীগের সদস্যরা সহজ শর্তে ঋণ দেবে। ১৬ নম্বর ধারা অনুসারে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেমন অর্থনৈতিক বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এটি তার বিপরীত ধারণা। কিন্তু এই ধারণাটি নিরস্ত্রীকরণ কনভেনশনের পরিপূরক হওয়ায়, এটি প্রস্তাবের স্তরেই থেকে যায়।

১৯২৭ সালে নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা বারে বারে বাধাগ্রস্ত হয়। তখন জেনেভা প্রটোকলকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রস্তাব ওঠে। ১৯২৭ সালে সাধারণ সভার অধিবেশনে পোলান্ডের প্রতিনিধিরা ঘোষণা করেন, "সব রকমের আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে বর্তমানে এবং চিরতরে নিষিদ্ধ করা হবে।" এই ঘোষণা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৯২৭ ও ১৯২৮ সালের মধ্যে সাধারণ সভার নিরাপত্তা ও সালিশি সংক্রান্ত কমিটি অক্লান্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ শুরু কের। নরওয়ের প্রতিনিধি প্রস্তাব করে, জেনেভা প্রটোকটেলর মতো একটি ব্যাপক ব্যবস্থা জাতিসংঘের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত না করে কতকগুলি আদর্শচুক্তির খসড়া রচনা

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ সামরিক সাহায্য দিতে অস্বীকার করে। তাদের আশঙ্কা ছিল এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডে সঙ্কট ছড়িয়ে পড়লে, তাদের ওপর সামরিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনের বোঝা নেমে আসবে। বিশেষত, তাদের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ ঘটবে বলে তারা অনুমান করেছিলেন। বাধ্যতামূলকভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের নীতি ও আক্রমণকারী দেশকে যৌথভাবে শাস্তিদানের নীতি মেনে নিতে অধিকাংশ দেশই প্রস্তুত ছিল না।

লীগের মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় ফ্রান্স জার্মানির সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে। জেনেভা প্রটোকলের মাধ্যমে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সার্বিক প্রতিরোধের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

আঞ্চলিক স্তরে নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার জন্য জার্মানি ফ্রান্সের কাছে ১৯২২, ১৯২৩, ১৯২৪ সালে বারংবার পারস্পরিক সমঝোতার প্রস্তাব করে। কিন্তু ফ্রান্স তা মেনে নেয়নি। তখন সে তার নিজস্ব মৈত্রী ব্যবস্থা গড়ে তোলায় ব্যস্ত ছিল। এর পরবর্তী পর্যায়ে সে তার প্রতিপক্ষ জার্মানির সঙ্গে আপোষ মীমাংসার নীতি গ্রহণ করে।

ইতিমধ্যে, ১৯২৩ সালে গুস্তাভ স্ট্রেসেসম্যান জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। তিনি তার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির দ্বারা অনুভব করেছিলেন, সামরিকভাবে দুর্বল জার্মানিকে ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে স্থান করে নিতে হলে সূক্ষ্ম কূটনৈতিক পরিকল্পনার আশ্রয় নিতে হবে। তিনি সঠিকভাবে অনুমান করতে পেরেছিলেন, ইংলন্ড পশ্চিম ইয়োরোপে ফ্রাঙ্কো-জার্মান দ্বন্দ্বের শান্তি পূর্ণ মীমাংসায় আগ্রহী। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কায় ক্লিষ্ট ফ্রান্স, জার্মানির সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নেবার জন্য ইংলন্ডের অনুরোধে সাড়া না দিয়ে পারবে না।

জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমন একটি প্রস্তাব দেন যাতে ফ্রান্সের নিরাপত্তার নিম্নতম দাবি মেনে নিয়েও জার্মানি বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তার লক্ষপূরণ করতে পারবে। ফ্রান্স চেয়েছিল জার্মানি পশ্চিম ইয়োরোপে স্থিতাবস্থা এবং রাইনের বেসামরিকীকরণ মেনে নেবে এবং এই দুটি ব্যাপারে ইংলন্ড দায়িত্বশীল থাকবে। শেষ পর্যন্ত ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে সুইজারল্যান্ডের লোকার্নো শহরে ফ্রান্স, ইংলন্ড জার্মানি, ইতালি এবং বেলজিয়াম-জার্মানি সীমান্ত স্বীকৃত হয়। একদিকে জার্মানি এবং অন্যদিকে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোলান্ডের মধ্যে সালিশি চুক্তি সম্পাদিত হয়। একদিকে ফ্রান্স এবং অন্যদিকে চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোলান্ডের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯২৫ সালের ১ ডিসেম্বর লন্ডনে এই চুক্তিগুলি বিধিবদ্ধ হয়। রাইনল্যান্ডের বেসামরিকীকরণ স্বীকৃত হয়।

সর্বত্র লোকার্নো চুক্তিকে স্বাগত জানান হয়। জার্মান, ফরাসি এবং ইংরেজ কূটনৈতিকরা এক সঙ্গে পান-ভোজন করলেন। ভার্সাই পরবর্তী ছয় বছরের তিক্ততার সাময়িক অবসান ঘটল। ব্রিঁয়াকে শান্তির দেবদূত (Archangel of peace) বলে অভিনন্দন জানান হয়।

লোকার্নো চুক্তির আপাত উচ্ছ্বাসের আড়ালে লুকিয়েছিল এর ত্রুটিগুলি। প্রথমত, জার্মানি তার পশ্চিম সীমান্তকে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি দেবার পরই সেই সীমান্ত রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করল। অর্থাৎ প্রমাণিত হল, জার্মানির উপর চাপিয়ে দেওয়া দায়িত্বের তুলনায়, স্বেচ্ছা আরোপিত দায়িত্বের নৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, গ্রেট ব্রিটেন যেভাবে কিছু সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব স্বীকার করেছিল আবার কিছু সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করেছিল, তাতে অনুমান করা যায়, ইংলন্ডের কাছে নিরাপত্তার দিক থেকে বিভিন্ন সীমান্তের গুরত্বের তারতম্য ছিল। পশ্চিম ইয়োরোপে স্থিতাবস্থা রক্ষায় আগ্রহী হলেও ইংলন্ড পূর্ব ইয়োরোপের ভৌমিক সীমান্ত

দেখা হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছিল জেনেভা সম্মেলনে। ইয়োরোপীয় কূটনৈতিকরা শেষ পর্যন্ত যৌথ নিরাপত্তা অর্জনের সঠিক পথে পা বাড়িয়েছিলেন। কেবলমাত্র অস্ত্রহ্রাসের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবেই নয়, যৌথ নিরাপত্তা যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র ভিত্তি—তা নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। ("The paramount importance of security, not only as a preliminary step to any considerable limitation of armaments, but also as the only foundation on which a durable peace could be established, had been generally recognized.")

জেনেভা প্রটোকলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু কিছু আপত্তি উঠতে পারে। অধ্যাপক গ্যাথোর্ন হার্ডি দেখিয়েছেন, জেনেভা প্রটোকলে নির্ধারিত পদ্ধতি সব সময়ে সালিশির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ, পোলিশ করিডরের বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। আইনের দিক থেকে আলোচ্য ভূখণ্ডে পোলান্ডের দাবি অবিসম্বাদিত। কাজেই এই বিষয়ে নিষ্পত্তি করার একমাত্র বিকল্প আপোষ-রফা। কিন্তু আপোষ-রফা, একপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও অপরপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য না হবার সম্ভাবনা থেকে গিয়েছিল। জার্মান রাজ্যের সঙ্গে পূর্ব প্রাশিয়াকে সংযুক্ত করতে গেলে পোলান্ডকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হ'ত। উত্তর থেকে দক্ষিণের পরিবর্তে পূর্ব থেকে পশ্চিমে একটি পথ গড়ে উঠত—যে পথ পোলান্ডের কাছে গ্রহণযোগ্য হত না। এই ক্ষেত্রে প্রটোকল নিরাপত্তা সমস্যার কোনো নতুন সমাধান দিতে পারেনি। সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত এই প্রটোকলটি ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯২৪ সালে এই প্রটোকলটি গৃহীত হলেও পরের বছর বসন্তকালে এই প্রকল্পটির মৃত্যু ঘটে। ইয়োরোপের ছোট ছোট দেশগুলি নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রটোকলকে সমর্তন জানালেও ইংলন্ড ও তার অধীনস্থ ডোমিনিয়নগুলি বিভিন্ন কারণে এই প্রটোকলে আপত্তি জানায়।

১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসে লেবর সরকারের কর্ণধার এবং জেনেভা প্রটোকলের মুখ্য প্রবক্তা মাকডোনাল্ড সরকারের পতন ঘটে এবং রক্ষণশীল সরকার কায়েম হয়। এই সরকার মির ও রাশিয়ার সমস্যা নিয়ে বিব্রত থাকায় প্রটোকল অনুমোদনের বিষয়ে সময় প্রার্থনা করে এবং শেষ পর্যন্ত প্রটোকলের শর্তগুলি মেনে নিতে অস্বীকার করে।

প্রটোকলের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এসেছিল সমুদ্রপারের ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলির কাছ থেকে। ইয়োরোপের ঝটিকাকেন্দ্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার ফলে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নযুক্ত রাজ্যগুলি কোনো সামরিক বা অর্থনৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী রাষ্ট্র কানাডা মার্কিন বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কানাডার রাষ্ট্রদূত ডান্ডুরান্ডের (Dandurand) মন্তব্যে প্রটোকলের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—"এই অগ্নি নিরোধক বীমায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সদস্য দেশের ঝুঁকি সমান নয়। দাহ্য পদার্থ থেকে বহু দূরে আগুনের বিপদমুক্ত একটি গৃহে আমরা বাস করি।" (In the association of mutual insurance against fire, the risks assumed by the different states are not equal. We live in a fire-proof house far from inflammable materials") অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ জড়িত না থাকলে কোনও দেশই যৌথ নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্ব পালনে আগ্রহী ছিল না।

লীগের একাদশ ধারা অনুসারে লীগ কাউন্সিলকে কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানে হস্তক্ষেপ করার যে অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের মনঃপুত হয়নি।

২.২.১ জেনিভা প্রটোকল ও তার ব্যর্থতা

উপরোক্ত খসড়াচুক্তির আলোচনা মধ্যে দিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি যৌথ নিরাপত্তার মূল সমস্যায় পৌঁছতে পেরেছিল। যৌথ নিরাপত্তা যে অস্ত্রহ্রাসের প্রথম পদক্ষেপ নয়, এটি যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান ভিত্তি, তা নীতিগতভাবে সব রাষ্ট্র মেনে নেয়। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব খসড়াচুক্তির ভস্মরাশি থেকেই একটি বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পদ্ধতিগতভাবে, লীগের নিয়ন্ত্রণেই ফিরে যাওয়া হয়—লীগের নেতৃত্বেই পুনরায় শান্তিরক্ষা এবং আগ্রাসন প্রতিহত করার উপযুক্ত উপায় অনুসন্ধান করা হয়। জাতিসংঘের ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য গ্রীস ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিরা ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে লীগের সাধারণ সভার পঞ্চম অধিবেশনে একটি দলিল পেশ করে। এই দলিলটির নাম, "Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes" (আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার খসড়া চুক্তি)।

ম্যাকডোনাল্ড ও এরিয়র উপস্থিতিতে এই খসড়া প্রস্তুত হয়। এই চুক্তিপত্রের মাধ্যমে জাতিসংঘের সনদেও সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া, বাধ্যতামূলক সালিশের মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। ১৯২৪ সালের ২রা অক্টোবর প্রটোকলটি উপস্থাপিত হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় ১৭টি দেশের সদস্য এতে স্বাক্ষর করে।

জেনেভা প্রটোকলে আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। প্রথমত, দলিলে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র কখনই পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক আইন বা চুক্তির শর্ত ব্যাখ্যার ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দিলে তা আন্তর্জাতিক আদালতে পাঠান হবে। তৃতীয়ত, সমস্ত বিরোধকে লীগ কাউন্সিলের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। চতুর্থত, লীগ কাউন্সিল কোনো বিরোধের মীমাংসা সম্বন্ধে একমত না হতে পারলে সালিশের কাছে পাঠান হবে। এই সালিশের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। পঞ্চমত, শান্তিপূর্ণ পন্থাগুলি যে অস্বীকার করবে তাকে আক্রমণকারী বলে চিহ্নিত করা হবে। ষষ্ঠত, আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এমনকি প্রয়োজনবোধে সামরিক ব্যবস্থাও প্রয়োগ করা হবে। কোনো রাষ্ট্র নিজের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ করলে লীগ কাউন্সিল তাকে সমর্থন করবে এবং সামরিক সাহায্য দেবে। সপ্তমত, যুদ্ধ সৃষ্টির শাস্তি হিসাবে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। অষ্টমত, ১৯২৫ সালের ১৫ জুনের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রস্তুতি সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশেষে, প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদে হস্তক্ষেপ করার অধিকারও লীগ কাউন্সিলকে দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ জেনেভা প্রটোকল লীগের সনদের নানা ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিল যেমন কোনো বিবাদে কাউন্সিল একমত না হলে, অথবা কোনো বিবাদ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে নির্ধারিত হলে, যুদ্ধ আটকানো যেত না। এই ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রথমত, এই প্রটোকল আক্রমণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে তা স্থির করার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, কোনো সমস্যার সমাধানে লীগ ব্যর্থ হলে কি উপায় অবলম্বন করা হবে সে বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ ছিল না। জেনেভা প্রটোকল এইসব ক্ষেত্রে সালিশির প্রস্তাব করেছিল। সালিশির সিদ্ধান্তকেই সব রাষ্ট্রকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। তৃতীয়ত, আভ্যন্তরীণ সমস্যা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করার জন্যও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র লীগের কাছে আবেদন জানাতে পারত। চতুর্থত, এই প্রথম নিরস্ত্রীকরণকে যৌথ নিরাপত্তার অঙ্গরূপে

উপর।" পারস্যের নেতিবাচক ভোটের ফলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। ১০ নম্বর এবং ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ দুটি আনুষ্ঠানিকভাবে সংশোধন না করা হলেও স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সঙ্কটের সময় এই অনুচ্ছেদ দুটি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সহজ হবে না এবং জেনিভার কার্যনির্বাহক সভা কোনো দ্রুত সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনে আগ্রহী নয়।

এই পরিস্থিতিতে, গ্রেট ব্রিটেন ও ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের সদস্যদের কাছে লীগ প্রধানত আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র এবং আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলার উপায় হয়ে ওঠে। তাদের মতে, চুক্তিপত্র যেভাবে স্বাক্ষরকারীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তা একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। ফলত, যে যৌথ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে জাতিসংঘ গড়ে উঠেছিল তা ক্রমশ মরীচিকায় পর্যবসিত হয়। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে শেষ পর্যন্ত নিজ নিজ নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব সামরিক শক্তি এবং মিত্র রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল।

যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় আস্থাশীল হওয়া এবং জোটবদ্ধতাকে নিরাপত্তারক্ষার প্রধান হাতিয়ার বলে মনে করার ফলে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি প্রায় প্রাক্-যুদ্ধ অবস্থায় ফিরে যায়। ১৯২২ সালে লর্ড রবার্ট সিসিল টেম্পোরারি মিক্সড্ কমিশনের সামনে চারটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

(ক) অস্ত্র হ্রাস পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে গেলে সাধারণভাবে সকলকেই এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করতে হবে।

(খ) নিরাপত্তারক্ষার প্রতিশ্রুতির ওপরেই অস্ত্রহ্রাস নির্ভর করবে।

(গ) নিরাপত্তার এই প্রতিশ্রুতি (guarantee) সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য।

(ঘ) অস্ত্রহ্রাস সম্পর্কিত মুচলেকার ভিত্তিতেই এই ধরনের প্রতিশ্রুতি গড়ে ওঠা সম্ভব।

লীগের সাধারণ সভায় এই প্রস্তাবগুলি আলোচিত হবার পর লর্ড রবার্ট সিসিল ও কলোনেল রিকুইন (Col. Requin), যিনি তৃতীয় প্রস্তাবটির কঠোর সমালোচক ছিলেন, দুই জনে দুটি খসড়া প্রস্তাব জমা দেন। এই দুটি খসড়ার ভিত্তিতেই Draft Treaty of Mutual Assistance রচিত হয়।

খসড়া চুক্তিটি একটি সাধারণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে আঞ্চলিক মৈত্রী ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে, এই সমন্বয়ের মৌলিক ত্রুটি তুলে ধরে। একটি আক্রমণাত্মক যুদ্ধের (যা আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ বলে পরিগণিত) সম্মুখীন কোনো সদস্যকে সাহায্য করার দায়িত্ব প্রতিটি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের, কিন্তু স্থলযুদ্ধ, নৌযুদ্ধ বা বিমান যুদ্ধের অধিকার কয়েকটি মুষ্টিমেয় ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের কুক্ষিগত ছিল। আক্রমণকারীকে চিহ্নিত করার দায়িত্ব জাতিসংঘের ওপর ন্যস্ত হলেও স্বেচ্ছায় আঞ্চলিক মৈত্রী ব্যবস্থা গড়ে তোলার অনুমোদন ছিল। তবে আঞ্চলিক মৈত্রী জোট ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তাদের আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করে লীগ তাদের শাস্তি দিতে পারত। এইভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছাড়া, অন্য কোনো কারণে গঠিত মৈত্রীজোটের সম্ভাবনা রোধ করা হয়। শাস্তিদানের দায়িত্ব প্রধানত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির হাতে তুলে দেওয়ায় ইংলন্ড ও তার অধীনস্থ ডোমিনিয়নের ভূমিকার ক্ষেত্রে এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। ইংলন্ডের সাম্রাজ্য জগৎ-জোড়া। এই জগৎ-জোড়া সাম্রাজ্যের একাংশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে অথচ অন্য অংশে শান্তি বজায় থাকলে যে পরস্পর বিরোধিতার সৃষ্টি হত, তা এড়ানোর জন্য ইংলন্ড এই চুক্তির বিরোধিতা করে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার নিরপেক্ষ দেশগুলির আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি পরিত্যক্ত হয়।

রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামরিক দিক থেকে নিরাপত্তাবোধের অভাব জার্মানিকে প্রতিহিংসা পরায়ণ করে তুলবে ; অর্থাৎ পরোক্ষভাবে যৌথ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

ভার্সাই চুক্তির পাশাপাশি একই সময়ে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ফ্রান্সের একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে জার্মানি বিনা প্ররোচনায় ফ্রান্সকে আক্রমণ করলে, ব্রিটেন ও আমেরিকা তৎক্ষণাৎ ফ্রান্সের সাহায্যে এগিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু মার্কিন সেনেট ভার্সাই চুক্তি ও লীগ কভেন্যান্ট অনুমোদন না করায় ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়। জাতিসংঘের সনদ ছাড়া সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নিরাপত্তারক্ষার কোনো উপায়ই রইল না। সে লীগের অনুমতি ব্যতিরেকেই রাইনল্যান্ড ও রূঢ় দখল করে নেয়।

প্রসঙ্গাক্রমে জাতিসংঘে অনুমোদিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনা করা যায়। লীগ চুক্তিপত্রে ১০ নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কোনো সদস্য বিনা প্ররোচনায় আক্রান্ত হলে তারা আক্রান্ত রাজ্যটির অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করবে। যদি কোনো সদস্য রাষ্ট্র তার দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে ১৬ নম্বর ও ১৭ নম্বর ধারা অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। ইংলন্ড ১০ নম্বর ধারাটি অনিচ্ছা সহকারে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য আন্তর্জাতিক কমিটি গঠনের যে প্রস্তাব ফ্রান্স দিয়েছিল তা ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। সনদের ১৬ নম্বর ধারা অনুসারে যে কোনো আগ্রাসী রাষ্ট্রের সঙ্গে জাতিসংঘের সদস্যদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা ছিল বাধ্যতামূলক।

এই চুক্তিপত্রের কতকগুলি ত্রুটি ছিল। প্রথমত, কোনো রাষ্ট্রীয় বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিতে গেলে লীগ পরিষদের 'সর্বসম্মত সুপারিশে'র প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত, এই সর্বসম্মত সুপারিশ গ্রহণ করা, বা না করা সদস্যদের ইচ্ছাধীন ছিল। তৃতীয়ত, জাতিসংঘের প্রায় জন্মলগ্নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সদস্যপদ ত্যাগ করায় অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা (Sanction) বলবৎ করা বা কার্যকর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই, যৌথ নিরাপত্তার মূল ভিত্তিই দুর্বল হয়ে যায়।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে আহুত রাষ্ট্রসংঘের প্রথম অধিবেশনই বেশ কিছু রাষ্ট্র ১০ এবং ১৬ নম্বর ধারা সংশোধনের প্রস্তাব দেয়। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দ্রুত সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার বাধাগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কানাডা ১০ নম্বর অনুচ্ছেদটি বাতিল করতে চায়।

স্ক্যানডিনেভিয়ার প্রতিনিধিরা ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখিত অর্থনৈতিক অবরোধ বলবৎ করার ব্যাপারে কিছু কিছু ব্যতিক্রমের দাবি জানায়। ১৯২১ সালে ১৬ নম্বর ধারার বিষয়ে প্রায় উনিশটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর ফলে, কোনো আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। জনৈক ফরাসী সমালোচকের মতে "আদি ১৬ নম্বর ধারার মূল শক্তি খর্ব করে তার পরিবর্তে লীগকে অন্য কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।" ("The result which we are in danger of having obtained is to have ruined the strength of original Article 16, without putting anything in its place.") উৎস : Gathorne Hardy, *A Short History of International Affairs (1920-39*। পরের বছর সাধারণ সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয়, জাতিসংঘই আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলবৎ করার তারিখ স্থির করে দেবে। ১৯২২ সালে উপস্থাপিত একটি প্রস্তাব অনুসারে স্থির হয়, "১০ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন নির্ভর করবে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের সংবিধানগত অধিকারের

১৯২২ সালে ফরাসি সরকার দাবি জানায় কেবলমাত্র ফ্রান্সের বাড়তি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হলে সে যুদ্ধাস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করবে। ১৯১৯ সালে পর থেকে ফ্রান্সের নিরাপত্তার দাবি আরও সম্প্রসারিত হয়েছিল। পূর্ব ও মধ্য ইয়োরোপে ফ্রান্সের অনুগত রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তাও ফ্রান্সের নিরাপত্তার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। যৌথ নিরাপত্তার আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠনরূপে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় ব্রতী হলেও, এক দশকের মধ্যেই যৌথ নিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তার ধারণার আপাত বিরোধিতা এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যবাহিনীর পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্যের ফলে, জাতিসংঘের কাজ দুরূহ হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের বিষয়ে কেবলমাত্র আংশিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল বলেই যে জাতিসংঘ অকার্যকর হয়ে পড়ে তা নয়। একটি সুসংগঠিত কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অভাবেই এই ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

লীগ কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত ছাড়াই স্বতঃসিদ্ধভাবে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা সম্ভব ছিল। তত্ত্বগতভাবে আশা করা হয়েছিল এর ফলে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অবিলম্বে যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু বাস্তবে, তা সম্ভব হয়নি।

বিংশ শতকের বিশের দশকে ইয়োরোপের নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রশ্নে তিনটি প্রধান প্রবণতা লক্ষ করা যায়—জার্মান প্রজাতন্ত্র চেয়েছিল শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করতে, ফ্রান্স ও তার ইয়োরোপীয় মিত্ররা চেয়েছিল যে কোনও উপায়ে জার্মানির ওপর শান্তিচুক্তি সংক্রান্ত বাধ্য বাধকতাগুলি চাপিয়ে দিতে। ইংলন্ড আমেরিকার সমর্থন পুষ্ট হয়ে শান্তিচুক্তির আপত্তিজনক ধারাগুলি বাদ দিয়ে জার্মানির সঙ্গে আপোষ করতে চেয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে ইংলন্ডের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জকে রক্ষা করা, তার সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা এবং সামুদ্রিক পথকে নিয়ন্ত্রিত করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং শান্তিচুক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রধান অন্তরায় দূর করেছিল। জার্মান সীমান্তের বাইরে জার্মানির প্রভাব বিস্তারের পথ রোধ হয়েছিল। অন্যদিকে রুশ সাম্রাজ্যের পতন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দ্বিতীয় বাধা দূর করেছিল। পূর্ব এশিয়ায় জাপানের আগ্রাসন-আকাঙ্ক্ষা ইয়াংসি নদীর উত্তর দিকেই আবদ্ধ ছিল, কাজেই ইংলন্ডের সামুদ্রিক স্বার্থের একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল ফ্রান্স। একদিকে, সিরিয়া ও লেবাননে ফ্রান্সের নবলব্ধ অভিভাবকত্ব (mandate) ও তুরস্কের সঙ্গে ষড়যন্ত্র এবং অন্যদিকে, ইংলন্ড পূর্ব ভূমধ্যসাগরে নিজের একক প্রাধান্য বজায় রাখতে আগ্রহী হয়ে ওঠায় ইংলন্ড ও ফ্রান্স পরস্পরের শত্রু হয়ে ওঠে।

নিজের সাম্রাজ্য বজায় রাখার জন্য ইংলন্ড ইয়োরোপে শক্তিসাম্য বজায় রাখতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, সে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নৌশক্তি ও বিমানশক্তি বৃদ্ধিকে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

স্বাভাবিকভাবে ২০-র দশকে ইংলন্ড বল প্রয়োগের দ্বারা পশ্চিম ইউরোপের ভৌমিক বিন্যাসকে রক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল না। আবার, উল্টোদিকে সে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য জার্মান অগ্রগতিকেও মেনে নেয়নি। ইংলন্ড ও ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে উভয় দেশের গুরুতর মতপার্থক্য ছিল। ফরাসিরা চেয়েছিল ভার্সাই চুক্তিকে কঠোরভাবে বলবৎ করতে, তাদের ধারণা হয়েছিল কোনো একটি ধারাকে প্রত্যাহার করে নিলেই জার্মানির সংশোধনকারী প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। ফ্রান্সের তুলনায় জার্মানির জনসংখ্যা ও শিল্পের দিক থেকে বেশি শক্তিশালী হওয়ায় সে সহজেই ইয়োরোপের শক্তিসাম্যকে বিনষ্ট করতে পারবে।

অন্যদিকে, ইংলন্ডের নীতিনির্ধারকেরা বিশ্বাস করতেন, ভার্সাইচুক্তির আপত্তিজনক ধারাগুলি প্রত্যাহার করে নিলে জার্মানিকে সন্তুষ্ট করা যাবে। আর, ভার্সাইচুক্তিকে পুরোপুরি প্রয়োগ করলে জার্মানিতে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা,

দেয়নি, যে কোনো স্বাক্ষরকারী আক্রান্ত হলে তাকে রক্ষা করার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিল। ইয়োরোপীয় শক্তিসমবায়ের ধারণার মধ্যে একটি শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞার ধারণা জন্মায়। এই অস্ত্র ব্যবহার করে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা এবং শান্তি রক্ষা সম্ভব হবে বলে আশা করা হয়েছিল। এই আশাই যৌথ নিরাপত্তার প্রাণ। উইলসন লীগের সদস্যদের কাছে যৌথ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দাবি করেছিলেন, কিন্তু লীগ কোনোদিনই যৌথ নিরাপত্তা-রক্ষাকারী সংস্থা হয়ে উঠতে পারেনি। লীগের সদস্যরা নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতেই বেশি আগ্রহী ছিল, আন্তর্জাতিক স্তরে যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। তাই অধ্যাপক ক্লোজিয়ার বলেছেন, "অন্তরের অন্তঃস্থলে লীগ ছিল পুরানো কূটনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক সম্মেলন, নতুন কূটনীতির প্রতি তার আগ্রহ ছিল নিতান্ত স্বল্প।" (At its heart the League was a permanent international conference, more in aid of the 'old diplomacy' than the embodiment of the 'new'.)

কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পারস্পরিক সন্দেহ ও বিদ্বেষের বাতাবরণে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্র সমানভাবে আস্থা রাখতে পারেনি। গড়ে উঠেছিল নানাধরনের আঞ্চলিক নিরাপত্তা প্রচেষ্টা। ফ্রান্স যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর শেষ পর্যন্ত আস্থা রাখতে পারেনি। সে গড়ে তুলেছিল তার নিজস্ব মৈত্রী ব্যবস্থা।

যৌথ নিরাপত্তা প্রচেষ্টার সমান্তরাল রেখায় চলেছিল নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনগুলি। অস্ত্র হ্রাস না ঘটলে নিরাপত্তা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। আবার নিরাপত্তার বোধ প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাভাবিক ভাবেই অস্ত্র হ্রাসের পরিবেশ গড়ে উঠত। এই এককে আমরা আলোচনা করব কীভাবে' ৩০-এর দশকে একে একে যৌথ নিরাপত্তা প্রচেষ্টা, আঞ্চলিক নিরাপত্তা প্রচেষ্টা এবং ফ্রান্সের একক নিরাপত্তার অনুসন্ধান শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

২.২ যৌথ নিরাপত্তার ধারণা—নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা

বিশ শতকের গোড়া থেকেই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও নিরস্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৮৯৯ এবং ১৯০৭ সালে আহুত হেগ সম্মেলন এই আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সূচক। মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের উদ্যোগে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

জাতিসংঘের প্রস্তাবনায় (Preamble) বলা হয়েছিল, জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হল 'আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জনের জন্য যুদ্ধের পথ গ্রহণ না করার দায়িত্ব স্বীকার করা।'

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং যুদ্ধের পথ পরিত্যাগ করার জন্য রাজনৈতিক দর্শনের স্তর যৌথ নিরাপত্তার আদর্শকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণ করার পাশাপাশি প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কিন্তু যৌথ নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের ধারণা দুটি শেষ পর্যন্ত পরস্পর বিরোধী হয়ে ওঠে।

চুক্তিপত্রের আট নম্বর ধারা অনুসারে জাতিসংঘের সমস্ত সদস্য স্বীকার করে নিয়েছিল, আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার জন্য জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজন মিটিয়ে প্রতিটি রাষ্ট্রকে জাতীয় অস্ত্রের পরিমাণ নিম্নস্তরের হ্রাস করতে হবে। একদিকে, মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি জার্মানিকে নৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেয়, জার্মানির নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে তারাও সাধারণভাবে নিরস্ত্রীকরণের দিকে অগ্রসর হবে। অন্যদিকে, তারা এটাও মেনে নিল যে অস্ত্রের পরিমাণ কমানোর ক্ষেত্রে 'জাতীয় নিরাপত্তা'ই প্রধান বিবেচ্য। অধ্যাপক ই. এইচ. কারের মতে এই দুটি নীতির পরস্পর বিরোধিতাই নিরস্ত্রীকরণ তথা যৌথ নিরাপত্তার প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

একক ২ ❑ নিরাপত্তার সন্ধানে

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ যৌথ নিরাপত্তার ধারণা—নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা

২.২.১ জেনিভা প্রটোকল ও তার বর্থ্যতা—লোকার্নো চুক্তি (১৯২৫)

২.২.২ প্যারিসের চুক্তি—কেলগে ব্রিঁয়া প্যাক্ট (১৯২৮)

২.৩.১ নিরাপত্তার সন্ধানে ফ্রান্স

২.৩.২ নিরাপত্তা প্রচেষ্টার ব্যর্থতা

২.৪ সারাংশ

২.৫ অনুশীলনী, প্রশ্নাবলি ও উত্তরসংকেত

২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ১৯১৯ সালে যৌথ নিরাপত্তার ধারণা
- জেনিভা প্রটোকল ও তার ব্যর্থতা—লোকার্নো চুক্তি
- প্যারিসের চুক্তি
- নিরাপত্তার সন্ধানে ফ্রান্স
- যৌথ নিরাপত্তার ব্যর্থতা

২.১ প্রস্তাবনা

১৯১৪ সালের পূর্ববর্তী এক শতকে ইয়োরোপের বৃহৎ শক্তিশালী পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের সূচনা করে, তারই এক ব্যাপকতর ও উন্নততর রূপ লীগ কভেন্যান্ট। যদিও ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় শক্তিসাম্যের ধারণার ওপরেই দাঁড়িয়েছিল, এই সংগঠনের দর্শনে আধুনিক যৌথ নিরাপত্তার ধারণাও অন্তর্নিহিত ছিল। 'শুধু বাইরের বিপদ থেকে নিরাপত্তা রক্ষাই নয়, সমবায়ের সদস্য কোনো শক্তি বিপজ্জনকভাবে ক্ষমতা বৃদ্ধি করলে তার বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধর পরিকল্পনাও সমবায়ের দায়িত্বের অন্তর্গত ছিল। অন্যদিক থেকে, জাতিসংঘ খুবই অভিনব, একেবারে পৃথক ধরনের একটি সংস্থা। এটির ভিত্তি একটি বহুমাত্রিক চুক্তি (multilateral treaty)—এই চুক্তির মাধ্যমে স্বাক্ষরকারীরা কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের পারস্পরিক বিবাদের মীমাংসা করার প্রতিশ্রুতি

৩। প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির অবসানের পর উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল?
উত্তর—১.৩.২।

৪। নবীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কি ধরনের মতাদর্শগত প্রতিবন্ধকতা এবং আভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল?
উত্তর—১.৩.৩।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। নিউলির চুক্তি কোন বছর কোন দেশের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল?

২। তুরস্কের সঙ্গে কোন দুটি চুক্তি কোন কোন বছর সম্পাদিত হয়েছিল?

৩। উইলসনের চৌদ্দ দফা দাবির দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার উল্লেখ করুন।

৪। গণতন্ত্রের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করুন।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। ডাবলিউ. সি. ল্যাঙ্গসাম ও ও. সি. মিশেল—*দ্য ওয়ার্ল্ড সিন্স*। 1991 (১৯৭১)।

২। এ্যালান শার্প, দ্য ভার্সাই সেটেলমেন্ট, *পীসমেকিং ইন প্যারিস* (১৯৯১)।

৩। ই. এইচ. কার প্রণীত দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : ১৯১৯-১৯৩৯, ভাষান্তর ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৯০)।

৪। ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস (১৯৯৪)।

ছিলেন, সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। তাছাড়া, মার্কিন সেনেট উইলসনের পরিকল্পনাকে সার্বিক সমর্থন দেয়নি। কাজেই শেষ পর্যন্ত উইলসনীয় আদর্শবাদ কার্যকর হয়নি।

ইয়োরোপীয় শক্তিসাম্যের ক্ষেত্রেও ভার্সাই চুক্তি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মধ্য ইয়োরোপের কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির পরাজয়, বলশেভিক বিপ্লব, বিচ্ছিন্নতাবাদী পররাষ্ট্রনীতির বন্ধন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে আসা এবং দূরপ্রাচ্যে জাপানের অভ্যুত্থান ইয়োরোপকেন্দ্রিক বিশ্বের পরিবর্তে এক আন্তর্জাতিক পৃথিবীর আবির্ভাব চিহ্নিত করে।

চুক্তি-ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে হ্যাবস্‌বার্গ এবং জার্মান—এই দুটি সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে রোমানভ শাসনের অবসান ঘটে। এই তিন সাম্রাজ্যের শূন্যস্থান পূরণ করে চেকোশ্লোভাকিয়া, ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া ইত্যাদি এগারোটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এই নবপ্রতিষ্ঠিত উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলি নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রথম, জাতিগত মিশ্রণের সমস্যা। বিভিন্ন জাতিভুক্ত মানুষ এক-একটি রাষ্ট্রে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল। এর ফলে সংখ্যালঘু সমস্যা জাতিগত সংঘাত তীব্র হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক সম্পদের অসম বন্টনের ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাময়িকভাবে প্রতিহত করেছিল। তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতিতে অভিজ্ঞতার অভাব নানান সাংবিধানিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। চতুর্থত, উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিরোধ এবং এই বিরোধে বৃহৎ শক্তিগুলির হস্তক্ষেপ অবস্থা জটিলতর করে তুলেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির জয় এবং উইলসনের আদর্শবাদী ঘোষণা ইয়োরোপে গণতান্ত্রিক মতাদর্শের সাফল্য সূচিত করে। নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সংসদীয় শাসনে অভিজ্ঞতার অভাব, জাতিগত ও শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব, পশ্চাদপদ অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র বাদ ও সাম্যবাদের বিরোধের সুযোগে রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী দলগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং যোগ্য নেতার অভাবে এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্টগুলিতে গণতান্ত্রিক প্রবণতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

মতাদর্শগতভাবে গণতন্ত্রের দুটি প্রধান বিরোধী শক্তি ছিল সমাজতন্ত্রবাদ ও ফ্যাসিবাদ। রুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও গৃহযুদ্ধে বিব্রত থাকায় বাইরের বিপ্লবগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে পারেনি। অন্যত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রচেষ্টা ১৯২০ সালের আগেই ব্যর্থ হয়ে যায়। অন্যদিকে, ফ্যাসিবাদী নেতাদের সম্মোহনী নেতৃত্ব, অবাস্তব প্রতিশ্রুতি, নৈরাশ্য পীড়িত বেকার যুবক, যুদ্ধফেরৎ সৈনিক এবং মধ্যবিত্তকে আকৃষ্ট করে। বড় শিল্পপতিরা সম্ভাব্য সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য সমর্থন জানিয়েছিল ফ্যাসিবাদকে। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে যৌথ নিরাপত্তার ব্যর্থতা, মহামন্দা, নিরস্ত্রীকরণের ব্যর্থতা, তোষণ নীতি ও ফ্যাসিবাদের ক্রমিক অগ্রগতি পৃথিবীকে নিয়ে যায় নতুন এক মহাযুদ্ধের দিকে।

১.৫ অনুশীলনী প্রশ্নাবলি ও উত্তরসংকেত

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। ভার্সাই সন্ধি কি জার্মানির পক্ষে একটি জবরদস্তিমূলক সন্ধি? আলোচনা করুন।
উত্তর—১.২.২।

২। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের পরিস্থিতি কি উইলসনীয় আদর্শ প্রয়োগের উপযুক্ত ছিল?
উত্তর—১.২.৩।

গণতন্ত্র এত দীর্ঘকাল অস্তিত্ব বজায় রাখল এটাই আশ্চর্যের বিষয়। যুদ্ধোত্তর পূর্ব ইয়োরোপের অস্থিরতা ও দুর্ভাগ্যের জন্য গণতান্ত্রিক সরকারগুলিকে দায়ী করা যুক্তিযুক্ত নয়। গ্রীস, বুলগেরিয়া এবং হাঙ্গেরির মতো যে দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল অথবা যারা দ্রুত পূর্বতন স্বৈরতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিতে ফিরে গিয়েছিল তাদের অবস্থাও গণতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় বিশেষ ভালো ছিল না। গণতন্ত্রের ব্যর্থতাও ইয়োরোপের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী ছিল। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের পরিস্থিতি, বিশেষত অর্থনৈতিক সঙ্কট যুদ্ধোত্তর শান্তিব্যবস্থাকে অকার্যকর করে তুলেছিল। গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ১৯৩৯ সালে পৃথিবীর যে ১২টি দেশে গণতন্ত্র টিকেছিল, সেই রাষ্ট্রগুলিতেই মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল সবচেয়ে বেশি।

১.৪ সারাংশ

১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দ ও তাঁর পত্নীর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যে ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সূচনা হত তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯১৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের চৌদ্দ দফা নীতি ঘোষণা ও জার্মান যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মধ্যে দিয়ে।

১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে প্রায় ৩২টি দেশের প্রতিনিধি মিলিত হয়ে শান্তি স্থাপনের কাজ আরম্ভ করেন। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন তিন জন : মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন, ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেসোঁ ও ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ। উইলসন তাঁর চৌদ্দতফা নীতির মধ্যে দিয়ে মুক্ত রাজনীতি জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ক্লেমেসোঁর লক্ষ্য ছিল জার্মানির ভবিষ্যৎ উত্থানকে প্রতিহত করে ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষা। লয়েড জর্জ এই দুই বক্তব্যের সমন্বয়সাধন করেন।

মিত্রপক্ষ জার্মানির সঙ্গে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জার্মানিকে যুদ্ধ-অপরাধী বলে চিহ্নিত করে তার উপর শাস্তিমূলক ধারা চাপিয়ে দেওয়া হয়। ভৌমিক ধারা, ঔপনিবেশিক ধারা, ক্ষতিপূরণ ধারা ও সামরিক ধারার মাধ্যমে জার্মানিকে শক্তিহীন করার চেষ্টা করা হয়।

এছাড়া, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সাঁ জার্মাঁর চুক্তি, হাঙ্গেরির সঙ্গে ট্রিয়াননের চুক্তি, বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউলির চুক্তি, তুর্কি সুলতানের সঙ্গে সেভেরের চুক্তি ও মুস্তাফা কামাল পাশার সঙ্গে সম্পাদিত লোসানের চুক্তি সম্পাদিত হয়।

একদল ঐতিহাসিক মনে করেন ভার্সাই চুক্তি একটি জবরদস্তিমূলক চুক্তি। জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাধারণ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হয়নি। নির্মমভাবে জার্মানিকে রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল ও পঙ্গু করে রাখার চেষ্টা করা হয়। এই নির্মমতার প্রতিক্রিয়ায় জার্মানিতে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ উপ্ত হয়।

এই মতের বিরুদ্ধে বলা যায়, সব সময়েই জয়ী পক্ষ পরাজিতের ওপর কঠোর চুক্তির শর্ত আরোপ করে। জার্মানি নিজেও ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর শর্ত আরোপ করেছিল। তাছাড়া, জার্মানির ক্ষতি ছিল পূরণযোগ্য, বরং ফ্রান্সের ক্ষতি ছিল অপূরণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির ভূমিকাকেও কেবলমাত্র ভার্সাই চুক্তির সঙ্গে যুক্ত করা চলে না। কারণ, ১৯৩৩ সালে যখন হিটলারের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা সফল হল, তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন যে আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তার জন্য সমকালীন হিংসাপীড়িত ইয়োরোপ কতটা প্রস্তুত ছিল এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উইলসন নিজেও কতটা আদর্শবাদী

যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বলতার সাধারণ ও বিশেষ আভ্যন্তরীণ কারণগুলি ছাড়াও মতাদর্শগত বিকল্পের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুটি বিকল্প পন্থা এ সময়ে প্রাধান্যলাভ করেছিল—সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ।

১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি ধ্বংস করে।

প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লেনিন সর্বহারা শ্রেণীর গণতন্ত্রের উল্লেখ করেছিলেন। এটি গণতন্ত্রে এক অভিনব রূপ। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার তত্ত্বে লেনিন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রাধান্য তুলে ধরেন। তাঁর মতে সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা সর্বহারা শ্রেণীর গণতন্ত্রের আদর্শকে বাস্তবায়িত করেছে।

লেনিন স্থাপিত বলশেভিক রাষ্ট্রই স্টালিনের পদাধিকার কালে এক আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। ১৯২৪ সালের পর ইয়োরোপ ও পৃথিবীর অন্যত্র বিপ্লবী নীতি প্রচারে এই রাষ্ট্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি।

১৯১৯ সালের লয়েড জর্জ বলেছিলেন 'গোটা ইয়োরোপ বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় উদ্দীপিত'। বাস্তবে ১৯২০ সাল নাগাদ অ-রুশ কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা দখলের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠেছিল। বাভারিয়া, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া এবং ইতালির পো উপত্যকায় উগ্র বামপন্থী বিপ্লবগুলি চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। তবে, সাম্যবাদ গণতন্ত্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে না পারলেও, সাম্যবাদ প্রচারের নীতি ও আশঙ্কা পশ্চিমি গণতান্ত্রিক নেতাদের তাড়িত করেছিল।

গণতন্ত্রের অনেক বড় শত্রু ছিল ফ্যাসিবাদ। ফ্যাসিবাদী তত্ত্বকে সংজ্ঞায়িত করা প্রায় অসম্ভব। তবে ফ্যাসিবাদের কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, ইংলন্ড ও ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতি তীব্র ঘৃণা ফ্যাসিবাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য। ফ্যাসিবাদের দ্বিতীয় শত্রু হল মার্কসবাদ। ই. নল্টের ভাষায়, বামপন্থার বিরোধিতাই দক্ষিণপন্থার উৎস। অর্থনৈতিক থেকে ফ্যাসিবাদ একদিকে, সমাজতন্ত্রবাদ এবং ট্রেড ইউনিয়ন পন্থা এবং অন্যদিকে, ধনতন্ত্র ও বৃহৎ শিল্পের বিকল্প। ফ্যাসিবাদ শ্রেণী-সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে একটি তৃতীয় পন্থা নির্ধারণের প্রতিশ্রুতি দেয়।

চতুর্থত, ফ্যাসিবাদীরা ডারউইনের 'যোগ্যতমের অস্তিত্বে'র তত্ত্বকে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। এই তত্ত্ব একদিকে, দুর্বলের ধ্বংসসাধন এবং অন্যদিকে সামরিক ক্ষমতা বিস্তারের যৌক্তিক ভিত্তি রচনা করে। এর ফলে সমরবাদের গৌরব বৃদ্ধি পায় এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সংগঠনের দিক থেকে ফ্যাসিবাদী দল এক সর্বশক্তিমান নেতার দ্বারা পরিচালিত। সাধারণ মানুষ এই নেতার সম্মোহনী শক্তি, যুগান্তকারী প্রতিশ্রুতি এবং সরল সমাধানে আকৃষ্ট হন।

ফ্যাসিবাদের সমর্থক সাধারণ বেকার, কর্মচ্যুত লুম্পেন প্রলেটারিয়ত ও গ্রামের কৃষক ও জমির মালিক। শান্তিচুক্তির শর্তে ক্ষুব্ধ এক বিপুল সংখ্যক সামরিক পদাধিকারী এবং ভেঙে-যাওয়া সৈন্যবাহিনীর প্রাক্তন সৈন্য, ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকের আর্থিক সংকটে বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত এবং সাম্যবাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা অর্জনের জন্য পুঁজিপতি ও বড় ব্যবসায়ীরা সমর্থন জানিয়েছিল ফ্যাসিবাদকে।

মতাদর্শগত বিকল্প পন্থার উন্মেষ ও বিকাশ এবং রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বশাসন প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। কাজেই অনতিবিলম্বেই যে নতুন রাষ্ট্রগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়েছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কীভাবে চেকোশ্লোভাকিয়া ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলিতে

হয়। প্রথম নির্বাচনের কয়েক দিনের মধ্যেই রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করা হয়। ১৯২৬ সালে পিলসুদস্কি সেনাবাহিনী ও কমিউনিস্টদের সমর্থনে সংবিধান পরিবর্তন করেন।

জোড়া-তালি দিয়ে তৈরি দক্ষিণপূর্ব ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির গণতন্ত্র ছিল নিতান্ত ভঙ্গুর। য়ুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং রুমানিয়ার সমস্যা ছিল নতুন জাতি গড়ে তোলা। বিভিন্ন জাতির সহাবস্থানের ফলে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, গণভোট প্রভৃতি আধুনিক পদ্ধতি রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। অন্যান্য ডানিয়ুবীয় গণতন্ত্রগুলির তুলনায় চেক গণতন্ত্রই সবচেয়ে দীর্ঘ স্থায়ী হয়েছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার সফল শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি এবং হ্যবস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞ আমলাতন্ত্র চেক প্রজাতন্ত্রের সাফল্যের প্রধান কারণ।

তিক্ত জাতিগত হিংসা অশান্ত বল্কান অঞ্চলে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে তুলেছিলেন। আলবানিয়ার ইতিহাস বল্কান গণতন্ত্রের প্রহসনমূলক চরিত্র তুলে ধরে। ১৯২০ সালে মুসলমান উপজাতীয় নেতা আহমেদ বে জগু আলবানিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালের বিপ্লবে বিতারিত হলেও পুনরায় ১৯২৫ সালে ফিরে আসেন এবং রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হন। অবশেষে ১৯২৮ সালে সংবিধান পরিবর্তন করে জগু রাজা প্রথম জগ নামে আলবানিয়ার রাজা হন।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল, নবসৃষ্ট ইয়োরোপীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় আকীর্ণ ছিল। স্বশাসনের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় আলোচ্য দেশগুলির পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে সংহত করায় কঠোর দায়িত্ব পালন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। জাতিগত দ্বন্দ্ব বহু রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল। কোনো কোনো রাষ্ট্রে বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রবল হয়ে উঠেছিল। তৃতীয়ত, এই দেশগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির তুলনায় অনেক পশ্চাৎপদ ছিল। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের আর্থিক সংকট এই পশ্চাৎপদতাকে তীব্রতর করে তুলেছিল। চতুর্থত, অর্থনৈতিক সংকট সমকালীন রাজনৈতিক দলগুলির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। উদারনৈতিক দলগুলি গণসমর্থন হারায়। গণবাদী (populist) এবং ক্যাথলিক পার্টিগুলি দক্ষিণপন্থী হয়ে পড়ে। রক্ষণশীলরা গণতন্ত্রবিরোধী এবং স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে পড়ে। বামপন্থী পার্টিগুলি সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের মধ্যে দোদুল্যমান ছিল।

কে. জে. নিউম্যান দেখিয়েছেন, উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও অনুপাত মূলকপ্রতিনিধিত্ব ইতালিতে গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিল এবং জার্মানিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করতেই বিপুল সময় এবং প্রচেষ্টা ব্যয় হত। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার মৌলিক রূপান্তর ঘটে যায়। রাষ্ট্রপ্রধানের পরিবর্তে তিনি বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যস্থ হয়ে ওঠেন। জাতীয় সংকটের সময় রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতা অধিকার করেন। এছাড়া সংবিধানে গণতন্ত্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। জার্মান সংবিধানে ৪৮ নম্বর ধারা রাষ্ট্রপতির হাতে অভূতপূর্ব ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। ১৯৩১ সালের পর থেকে জার্মান রাষ্ট্রপতি স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে ওঠেন।

এছাড়া, অন্তর্বর্তী পর্বে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক নেতার অনুপস্থিতি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিশেষভাবে দুর্বল করে তুলেছিল। ব্রিঁয়া বা স্ট্রেসেসম্যানের প্রতিভার সূক্ষ্মতা সাধারণ মানুষের কাছে ধরা পড়েনি। আলোচ্য পর্বের প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য নেতাই ছিলেন গণতন্ত্রের সমালোচক—হিটলার, পিলসুদস্কি এবং আরও অনেকে। এদের রাজনৈতিক যুক্তি যত দুর্বল, ব্যক্তিগত সম্মোহনী শক্তি ছিল ততই প্রবল। জাতীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ক্রমশ বৃহত্তর রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পরিবর্তে ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

গণসার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে একজাতিক রাষ্ট্রের সংবিধানরূপে জার্মান সংবিধান রচিত হয়। কিন্তু ভাইমার প্রজাতন্ত্রের সংবিধান ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে মৌলিক স্ববিরোধ থেকে গিয়েছিল।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক স্থগিতাদেশ দেওয়া ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় কাউন্সিলের আর কোনো ক্ষমতা ছিল না। বিচারবিভাগ, আমলাতন্ত্র ও সামরিক বিভাগে পুরাতনতান্ত্রিক আর্থসামাজিক শ্রেণীগুলির প্রাধান্য অটুট ছিল। প্রায় অপরিবর্তিত একটি সামাজিক বিন্যাসের ওপর আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়ায় তা শেষ পর্যন্ত অকার্যকর হয়ে পড়ে।

পরাজয়, শান্তিচুক্তির শর্তসমূহ এবং মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণ ক্ষোভের ফলে নতুন সরকার জনগণের আস্থা হারায়। এছাড়া, দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের কোয়ালিসন সরকার ছিল প্রথম থেকেই দুর্বল। ১৯২০ সালের ২০ মার্চ উল্‌ফ গ্যাঙ্গ ক্যাপের (Wolf Gang Kapp) এবং ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে আডল্‌ফ হিটলারের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও রাষ্ট্রক্ষমতা ক্রমশ রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থীদের হাতে চলে যায়। ১৯৩৩ সালে নাৎসি পার্টির ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে জার্মানিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটে।

ইতালিতে তৃতীয় ভিক্টর ইম্যানুয়েলের নেতৃত্বে (Victor Emmannuel III) সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেও টিকে ছিল। জার্মানির মতো ইতালির সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থাও গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অনুকূল ছিল না। ইতালির সংসদীয় সরকারগুলি ছিল অস্থির ও অনিশ্চিত। ১৯১৯ সালে দক্ষিণ ইতালিতে লুটতরাজ এবং উত্তর ইতালিতে শিল্পকেন্দ্রিক বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। ডি. অ্যানানজিও ফিউমের একটি অংশ অধিকার করেন। আর্থিক নৈরাশ্যও কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভীতিকে কাজে লাগিয়ে বেনিটো মুসোলিনির (Benito Mussolini) ফাসিস্ত দল দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ তরুণ, ভীত বুর্জোয়া ও শিল্পপতিরা সকলেই ফাসিস্ত ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১৯২২ সালের ২৮ অক্টোবর মুসোলিনি রোম অভিযান করেন। রাজা তৃতীয় ইমানুয়েলের আহ্বানে তিনি ৩০ অক্টোবর মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১৯২৪ সালের পর ইতালিতে পার্লামেন্টীয় শাসনের অবসান ঘটে এবং একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাঙ্গেরিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল আরও ক্ষণস্থায়ী। উদারনৈতিক অভিজাত মিহালি কারোলির (Mihaly Karolyi) অস্থায়ী সরকার ছিল নিতান্ত ক্ষণিক। কমিউনিস্ট নেতা বেলা কুনের নেতৃত্বে হাঙ্গেরিতে একটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমি শক্তিগুলি হাঙ্গেরি অবরোধ করে। অবশেষে ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে অ্যাডমিরাল নিকোলাস হর্থি (Nicholas Horthy) ক্ষমতা দখল করেন এবং কার্যত একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। অস্ট্রিয়াতে খ্রিস্টিয়ান সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের মিলিত প্রয়াসে অস্ট্রিয়ার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই দুই পার্টির মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, অর্থনৈতিক বিক্ষোভ এবং সংসদীয় শাসনে অনভিজ্ঞতার ফলে ১৯৩৪ সালে অস্ট্রিয়ায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে।

বাল্টিক সীমান্ত অঞ্চলে ভেঙে যাওয়া রুশ সাম্রাজ্যের রাজ্যাংশ নিয়ে গঠিত ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়ার ও লিথুয়ানিয়ায় চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি তুলনামূলকভাবে বেশি স্থায়িত্ব ও সাফল্য লাভ করেছিল। ১৯২০ সালে এস্তোনিয়ায়, ১৯২২ সালে লাটভিয়াও লিথুয়ানিয়ায় গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়। অবশ্য, লিথুয়ানিয়ায় গণতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালে সোভিয়েত আগ্রাসনের ফলে তিনটি রাষ্ট্র স্বাধীনতা হারায়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বিভক্ত পোলান্ডকে ঐক্যবদ্ধ করেন পিয়ানোবাদক পাডেরিস্কি—(Paderewski) ১৯২২ সালের প্রথম নির্বাচনেই রক্ষণশীল ও সমাজতান্ত্রিকদের বিরোধের ফলে এক সাংবিধানিক অচলাবস্থার সৃষ্টি

একদিকে, অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরী, প্যারিস, চুক্তির সংশোধন দাবি করে এবং ইতালিও জার্মানির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই প্রবণতা সম্পূর্ণতা লাভ করে জার্মানির অস্ট্রিয়া অধিগ্রহণে (Anschluss) এবং হাঙ্গেরির কনিটার্ন বিরোধী পক্ষে যোগদানে। দ্বিতীয় জোটের সদস্য ছিল পোলান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া ও রুমানিয়া। এই রাষ্ট্রগুলি একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সম্ভাব্য জার্মান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফরাসি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

১৯৩০-এর দশকে ফরাসি প্রভাব হ্রাস পায়। এর ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জার্মানির সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করে। চেকোশ্লোভাকিয়া শেষ পর্যন্ত জার্মানির বিরুদ্ধে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ১৯৩৮ সালে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মিউনিখ সঙ্কটে জার্মানি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির প্রতিনিধিরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় অংশ দখল করে। চেকদের সঙ্গে আলোচনাও করা হয়নি। হাঙ্গেরি ও পোলান্ড সুদেতানল্যান্ড ও দক্ষিণ স্লোভাকিয়ায় তাদের স্বদেশীয়দের ওপর দাবি জানায়। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে স্টালিন ব্রেস্টলিটভস্কের স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য হিটলারের সঙ্গে পোলান্ড ও পূর্ব ইউরোপকে সোভিয়েত ও জার্মান প্রভাবিত অঞ্চলে বিভক্ত করার চুক্তি করেন। প্যারিস ব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।

১.১.৩ নবীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতা ও সমস্যা

আগের অনুচ্ছেদে আমরা উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলির নানান সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে সাংগঠনিক ও সাংবিধানিক সমস্যার উল্লেখ করেছি। এই অনুচ্ছেদে আমরা নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতার কারণ বিশ্লেষণ করব। বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে মানুষের আশা ছিল শান্তি ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। স্বাভাবিকভাবেই শান্তি ও গণতন্ত্র পরস্পরের পরিপূরক ধারণা হয়ে ওঠে। সকলেই আশা করেছিল ১৯১৯ সালের পৃথিবী গণতন্ত্রের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে উঠেছে। মিত্রপক্ষীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি জয়মাল্য লাভ করায় নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যেন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও তুরস্কেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক, রাশিয়া, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির মতো স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরাজয় এবং ইংলন্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও আমেরিকার মতো গণতান্ত্রিক দেশের জয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জয় সূচিত করেছিল। এই দেশগুলি যে সবচেয়ে বেশি শিল্পায়িত এবং সম্মিলিতভাবে এই দেশগুলিই যে সামুদ্রিক অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে তা সকলের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই, একের পর এক নবগঠিত রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করেছিল।

প্রথমে আমরা পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের নিজস্ব সমস্যা আলোচনা করে, পরে মতাদর্শগত সমস্যাগুলি আলোচনা করব। জার্মানির প্রজাতন্ত্র কাগজে-কলমে একটি নিখুঁত গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করে। কিন্তু এই সংবিধানের প্রেক্ষাপট ছিল গৃহযুদ্ধ। যুদ্ধবিরতি ও সম্রাটের সিংহাসন ত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯১৮ সালের রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটেছিল। Spartacist-রা এই বিপ্লবের প্রয়াস নিয়েছিলেন। প্রথমে বার্লিন ও পরে মিউনিখে কাউন্সিল সরকার গঠিত হয়েছিল। অবশ্য এগুলি খুব শীঘ্রই দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯১৮ সালের শেষে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি (KPD) গঠিত হয়। তবে, ১৯১৯ সালে যখন নতুন জাতীয় সভা নির্বাচিত হয় রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকরা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলেন। শিল্পপতি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে সাময়িক আপোষ রফা সম্ভব হয়েছিল।

উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলিকে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেগুলি বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত মতগুলির আপেক্ষিক সত্যতা বোঝা যায়। এছাড়া, কেনই বা এই অঞ্চলগুলি আভ্যন্তরীণ সঙ্কট, একনায়কতন্ত্রের উৎসস্থল এবং আন্তর্জাতিক সংঘাতের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রসমূহের সামনে প্রথম সমস্যা হল জাতিগত গঠন। তত্ত্বগতভাবে প্যারিস সন্ধি যুক্তিসঙ্গত হলেও, এই ব্যবস্থা অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির প্রতি ন্যায়বিচার করেনি। নতুন রাষ্ট্রগুলির সীমানা এমনভাবে টানা হয়েছিল যাতে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু জার্মান ও ম্যগয়ার (Magyar) তাদের বাসভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ৩.১ লক্ষ সুদেতন জার্মান চেক শাসনের অন্তর্গত হয়েছিল, আর হাঙ্গেরীয় জনগোষ্ঠী চেকোশ্লোভাকিয়ার শাসনাধীন হয়েছিল। সুদেতনল্যান্ডের শিল্পগত গুরুত্বের ফলে এই অঞ্চলটি চেকোশ্লোভাকিয়ার অর্থনৈতিক অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এই অঞ্চল অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দেওয়া ভৌগোলিকভাবে সম্ভব ছিল না। মিত্রপক্ষ কোনো মতেই এই অঞ্চলকে জার্মানির হাতে তুলে দিত না।

অ-শ্লাভদের পরিবর্তে যে শ্লাভদের বেশি সুযোগ দেওয়া হয়েছিল—তাও ঠিক নয়। কখনও কখনও একই জাতির অন্তর্গত উপগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আর্থ-সামাজিক কারণে সংঘাত দেখা দিত। যেমন শ্লোভাকরা চেকদের বিরুদ্ধে একচেটিয়াভাবে ক্ষমতা অধিগ্রহণের অভিযোগ এনেছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে সাম্রাজ্যগুলি পতনের পর ডানিয়ুব অঞ্চলের জাতিগত সংঘাত আরও বেশি তীব্র হয়ে উঠেছিল।

অর্থনৈতিক বিরোধের ফলে জাতিগত সংঘাত আরো জটিল হয়ে উঠেছিল। যেভাবে সাম্রাজ্যের শিল্পভিত্তিক ও কৃষিভিত্তিক অঞ্চলগুলি বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল তাতে কোনও সমতা ছিল না। যেমন, চেকোশ্লোভাকিয়া সাম্রাজ্যের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৭% লাভ করলেও সাম্রাজ্যের ভারী শিল্পের মোট ৮০% লাভ করেছিল। তার ফলে চেকোশ্লোভাকিয়া যে কোন পশ্চিমি রাষ্ট্রের প্রতিযোগী হয়ে উঠেছিল। হাঙ্গেরি ৮০% থেকে ৯০% ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কাঠচেরাই উৎপাদন কেন্দ্র লাভ করলেও ৮৯% কম লৌহ আকর এবং ৮৫% কম কাঠ পেয়েছিল। বস্ত্রশিল্পের সূতাকলগুলি (Spinning mill) ছিল অস্ট্রিয়ার আর বস্ত্রবয়ন (weaving) শিল্পগুলি ছিল বোহেমিয়ায়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচার জন্য তাদের শিল্পের পরিপূরক দিকটি তৈরি করে নিয়ে হয়েছিল। ২০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আশানুরূপ অর্থনৈতিক বিকাশ হয়েছিল। ১৯২৯ সাল থেকে মহামন্দার প্রভাবে এই অগ্রগতিতে ভাটা পড়ে।

রাজনৈতিক অস্থিরতার একটি কারণ অর্থনৈতিক সঙ্কট, অপর কারণ সাংগঠনিক ত্রুটি। ১৯১৮ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে প্রায় প্রতিটি উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রেই পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে চেকোশ্লোভাকিয়া ছাড়া মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপের প্রতিটি দেশেই গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল। [১.৩.৩. অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।]

চতুর্থ সমস্যাটি আরও জটিল। ক্রমশ উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলি একে অপরের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। আবার বৃহৎ শক্তিগুলিও এই দ্বন্দ্বে পক্ষ অবলম্বন করে। হাঙ্গেরি তার প্রতিবেশী শ্লাভ রাষ্ট্রগুলির হাত থেকে ম্যগেয়ার অঞ্চলগুলি দখল করার সংশোধনবাদী নীতি অবলম্বন করে। অস্ট্রিয়া তার পূর্বতন মর্যাদা হারিয়ে জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। পোলান্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লিথুনিয়া অংশ নিয়ে ১৭৭২ সালের মানচিত্র ফিরিয়ে আনতে চায়। বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সীমানা বজায় রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৯২০ সালের পর এই সকল প্রচেষ্টা থেকেই দুই শক্তিজোট গড়ে ওঠে।

হয়। এর আট মাসের মধ্যে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে। যে রাশিয়া যুগ যুগ ধরে সব রকমের রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রতিহত করেছিল, সেই দেশে এই বৈপ্লবিক রূপান্তর দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। বিপ্লবের আগেই লেনিন "জাতীয় পরাজয়ে"র তত্ত্ব ঘোষণা করেন এবং বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালে বিজয়ী জার্মান পক্ষের সঙ্গে ব্রেস্টলিটভস্কের চুক্তি করেন। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে লেনিন ফিনল্যান্ড, এস্তানিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং পোল্যান্ড প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছেড়ে দেন।

এর পরেই উল্লেখ করা যায় অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের। এটি ছিল ইয়োরোপের সবচেয়ে বেশি মিশ্র-জাতির রাষ্ট্র—প্রায় ১৩টি পৃথক জাতিগোষ্ঠী এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির বৃহত্তম জনগোষ্ঠী ছিল স্লাভ—তার ম্যগেয়ার, চেক, শ্লোভাক, পোল, ইউক্রেনীয়, সার্ব, ক্রোট এবং স্লোভেন ইত্যাদি উপরিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হ্যাব্‌স্‌বার্গ সাম্রাজ্যের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছিল এবং রাজনৈতিক কাঠামোতে ভাঙন ধরিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৯১৮ সালে বিভিন্ন স্লাভ নেতারা রাষ্ট্র সমবায়ের পরিবর্তে পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যখন ১৯১৮ সালের ৩ নভেম্বর অস্ট্রিয় সম্রাট মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁরা সাম্রাজ্য থেকে তিনটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় : অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়া। অবশিষ্ট অংশগুলি ইতালি, রুমানিয়া, পোল্যান্ড এবং যুগোশ্লোভিয়ার মধ্যে বিভক্ত করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে যুগোশ্লোভিয়া ছিল নতুন রাষ্ট্র।

ধ্বংসপ্রাপ্ত তৃতীয় সাম্রাজ্যটি কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের জার্মান সাম্রাজ্য। ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমি শক্তিগুলি (অর্থাৎ ফ্রান্স ও ইংলন্ড) মার্কনি বাহিনীর সহায়তারে জার্মানির সীমান্ত অতিক্রম করে। অন্যদিকে, ইংলন্ডের নৌ অবরোধের ফলে জার্মান অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়ে। পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে ৯ নভেম্বর কাইজার পদত্যাগ করেন এবং একটি অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হয়।

১৯১৮ সালের শেষাশেষি তিনটি সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের ওপর গড়ে ওঠে এগারোটি নতুন রাষ্ট্র ; ফিনল্যান্ড এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোলান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, জার্মানি।

এই নবগঠিত রাষ্ট্রগুলির জন্মলগ্ন থেকেই এদের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। এই বিতর্কে তিনটি মত প্রাধান্য লাভ করে। প্রথমত, মাসারিকের (Masarky) মতো নবপ্রতিষ্ঠিত চেকোশ্লোভাকিয়ার নেতা এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন—'এই পরিবর্তন জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক চরিত্রের অবসান ঘটিয়ে লাঞ্ছিত মানুষকে তাদের নিজের পায়ে দাঁড় করাল।'

এরিখ আইকের (E. Eyck) মতো জার্মান ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ বিপরীত মতের প্রবক্তা। তিনি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন বহুজাতিক হ্যাবস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে, তাঁর মতে এই সাম্রাজ্যকে ভেঙে ফেলা একটি মৌলিক ভ্রান্তি। অধ্যাপক এ. জে. পি. টেলর উপরোক্ত দুটি মতের মাঝামাঝি বক্তব্য রেখেছেন। তিনি সাম্রাজ্যগুলির ক্ষণস্থায়িত্বের কথা স্মরণ রেখেও বলেছেন, এগুলিকে বাদ দিলে চলা অসুবিধাজনক। "যেভাবে প্লাস্টারের ছাঁচ ভেঙে যাওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ধরে রাখে, সেভাবে বংশানুক্রমিক সাম্রাজ্য মধ্য-ইয়োরোপকে ধারণ করেছিল। যদিও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সচল হবার আগে ছাঁচটি ভেঙে ফেলতে হয়, তবু এটিকে বাদ দিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সচলতা সফল বা সহজ হয়ে ওঠে না।" (The dynastic Empire sustained Central Europe, as a plaster cast sustains a broken limb; thought it had to be destroyed before movement was possible, its removal did not make movement successful or even easy.") A. J. P. Taylor Quoted is Stephen J. Lee, *The European Dictatorships*.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইয়োরোপের শক্তিসাম্যকে পুনর্বিন্যাস করা। ভার্সাই চুক্তি-প্রণেতারা পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হন। রুশবিপ্লব ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইয়োরোপের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির অবসান ঘটে ; প্রাচীন তুর্কি সাম্রাজ্য, রুশ সাম্রাজ্য, হ্যাবস্‌বার্গ সাম্রাজ্য এবং জার্মান সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির ফলে ইয়োরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে। রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পালাবদল ঘটে। একদিকে ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়া এবং ইয়োরোপের বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা ও জাপান রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

শান্তিপ্রণেতাদের দায়িত্ব ছিল জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং সামরিক নিরাপত্তা অনুসারে মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপের মানচিত্র পুনর্নির্মাণ করা। কার্যত, পূর্ব ও পশ্চিম ইয়োরোপের সমস্যার মীমাংসা হয়েছিল পৃথকভাবে।

এছাড়া, জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থানপতন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা সঙ্কোচন ইয়োরোপের রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ইয়োরোপীয় রাজনীতির সীমানায় আধা এশিয় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইয়োরোপের বাইরে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের উত্থান ঘটেছিল। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে রাজনৈতিক সংঘাতের নতুন নতুন কেন্দ্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী পর্বে শক্তিসাম্যের ধারণা ও যৌথ নিরাপত্তার ধারণার মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৯১৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি উইলসন চৌদ্দদফা দাবির দ্বিতীয় ধারায় বলেন, "মানুষ ও ভূখণ্ডকে গরুছাগলের মতো, বা দাবার বোড়ের মতো এক সার্বভৌমত্ব থেকে আর এক সার্বভৌমত্বে হস্তান্তরিত করা হবে না। শক্তিসাম্য নীতি এখন থেকে চিরতরে পরিত্যক্ত হল।" ("People and provinces are not to be bartered about from sovereignty to sovereignty as if they were mere chattels and pawns in a game, now for ever discredited, of the balance of power.") কার্যত, উইলসনের এই আশা পূরণ হয়নি। জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তার আদর্শ ও আঞ্চলিক স্তরে নিরাপত্তার আদর্শ (লোকার্নোচুক্তি, ১৯২৫ ও কেলগব্রিয়াঁ চুক্তি, ১৯২৮) ক্ষণিকের আশা জাগিয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল। ডেভিড টমসনের ভাষায়, "এটি ছিল মিশ্র ব্যবস্থার গোধূলি বেলা।" একটি অসম্পূর্ণ ইয়োরোপীয় সমবায় ও নবসৃষ্ট দুর্বল শক্তিসাম্যের সহাবস্থান ঘটেছিল। ("It was a twilight era of mixed systems." A newly recreated precarious balance of power coexisted with an imperfect Concert of Europe.) David Thomson, *Europe Since Nepoleon*.

১.৩.২ প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির অবসান ও তৎসংক্রান্ত সমস্যা

আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি (১.৩.১) কীভাবে ইয়োরোপকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান ঘটেছিল। এখন আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব কীভাবে প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির অবসান ঘটে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হ'ল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে প্রথমেই পতন ঘটেছিল জারতান্ত্রিক রাশিয়ার। ১৯১৬ সালে জার্মান সেনা বাল্টিক অঞ্চল ; পোল্যান্ড এবং ইউক্রেনে—রাশিয়ার গভীরে প্রবেশ করেছিল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পেট্রোগাদে স্বর্তঃস্ফূর্ত খাদ্যদাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। সরকার এই সঙ্কটের সমাধান করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যেই জারতন্ত্রের অযোগ্যতার বিরুদ্ধে সোশ্যাল রেভলুশনারি, মেনশেভিক এবং লিবারেলরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে জার (১৮৬৮-১৯১৮) দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং অস্থায়ী সরকার কায়েম

সেনেটের অধিবেশনে অনুমোদিত হতে গেলে ভার্সাই চুক্তি ও লীগ চুক্তিপত্রের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পড়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেনেটের সদস্যরা বিনা পরিবর্তনে লীগ-চুক্তিপত্রের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পড়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেনেটের সদস্যরা বিনা পরিবর্তনে লীগ-চুক্তিপত্র সংক্রান্ত শর্তটি পুরোপুরি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য বিদেশে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চান নি। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভার্সাই চুক্তি ও লীগ চুক্তিপত্রের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভ্রমণরত অবস্থায় রাষ্ট্রপতি উইলসনের মৃত্যু হয়।

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে উইলসনের আদর্শকে পুরোপুরি কার্যকর করা সম্ভব না হলেও এই নীতিগুলির গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করা যায় না। ফরাসী বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলি ইয়োরোপের মাটিতে যে নবীন ধারার জন্ম দিয়েছিল, উইলসন সেই মতাদর্শগুলিকেই পরিপূর্ণ রূপদান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান 'উন্মুক্ত রাজনীতির আদর্শ' এবং আন্তর্জাতিক বিবাদ-দি-সম্বাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য গঠিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার ক্ষেত্রে এই সংগঠনের ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার জন্য রাষ্ট্রপতি উইলসনকে দায়ী করা অযৌক্তিক। এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী সমকালীন কূটনৈতিক সমাজ ও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সমস্যাদীর্ণ জটিল পরিস্থিতি।

১.৩.১ পুরাতন ইয়োরোপকেন্দ্রিক শক্তিসাম্যের অবসান

আধুনিক ইয়োরোপের ইতিহাসে জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থানের পাশাপাশি গড়ে উঠছিল শক্তিসাম্যের ধারণা। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে দিয়ে যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করা হয়েছিল, সেই ধারণা সপ্তদশ শতকের রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রভাবিত করে। ইয়োরোপীয় শক্তিসাম্যের ধ্রুপদী যুগ বলতে ১৬৪৮ সাল থেকে ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নীয় যুগের শেষ পর্যন্ত বোঝায়।

জি. এল. ডিকিনসনের মতে ভারসাম্যের ধারণাটির দুটি অর্থ : এক অর্থ, দুই পক্ষের সমতা অর্থাৎ হিসাবে জমা ও খরচ যখন সমান থাকে। দ্বিতীয় অর্থ অসাম্য, অর্থাৎ ব্যাঙ্কে জমা আমানতে খরচের তুলনায় জমা অর্থের পরিমাণ যেমন সবসময়েই বেশি থাকে। শক্তিসাম্য নীতির প্রবক্তারা তাত্ত্বিক স্তরে সাম্যের আদর্শ ঘোষণা করলেও কার্যত এক অপরের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চান, অর্থাৎ অসম পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চান।

অধ্যাপক সিডনি বি. ফে. ***"এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সোশ্যাল সায়েন্সে"*** ভারসাম্যের ধারণাকে 'ন্যায্য ভারসাম্য' বলে অভিহিত করেছেন। এই আদর্শ কোনো একটিমাত্র রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রসমূহের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারে বাধা দেয়। মূল শক্তিসাম্যের সীমানার মধ্যে থাকে নানা আঞ্চলিক শক্তিসাম্য। আঞ্চলিক শক্তির সংঘাত কখনও কখনও প্রভাবিত করে মূল শক্তিসাম্যকে, যেমন পূর্ব এশিয়া বা পশ্চিম এশিয়ার আঞ্চলিক সংঘাত সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এছাড়া, সবসময়েই একটি প্রধান শক্তির দায়িত্ব থাকে শক্তি সাম্য বজায় রাখা। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে ইংলন্ডই ছিল ভারসাম্যরক্ষক। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষে ইয়োরোপে জার্মানির উত্থান ও শিল্পায়নের অগ্রগতি এবং বিংশ শতকের গোড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংলন্ডের একক প্রাধান্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছিল।

যখনই কোনো শক্তি এককভাবে এই শক্তিসাম্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করেছিল তখনই তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে শক্তিজোট গড়ে তুলেছিল। বিসমার্কের নেতৃত্বে ১৮৮২ সালে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি গড়ে ওঠার প্রতিক্রিয়ায় ত্রিপাক্ষিক আঁতাত তৈরি হয়।

অস্ত্র ছাড়া অন্য অস্ত্র হ্রাস ; (৫) নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঔপনিবেশিক দাবির মীমাংসা সাধন ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ অনুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপনিবেশগুলি পুনর্গঠন ; (৬) রাশিয়াকে হৃত রাজ্য প্রত্যাবর্তন ; (৭) বেলজিয়ামকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা ; (৮) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে স্বায়ত্বশাসনের অধিকারদান ; (৯) তুরস্ক সাম্রাজ্যের অমুসলমান জনগণকে স্বায়ত্বশাসনের অধিকারদান ; (১০) ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জাতিগুলির একটি সাধারণ সংঘ স্থাপন।

সাধারণত মনে করা হয় রাষ্ট্রপতি উইলসন চূড়ান্ত আদর্শবাদী, তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ বিমূর্ত ন্যায়ের আদর্শে—গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও জাতিসংঘের আদর্শ প্রতিষ্ঠায়। ক্লেমেসোঁ প্রখর বাস্তববাদী, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ ফ্রান্সের নিরাপত্তারক্ষা এবং জার্মানিকে চিরতরে ধ্বংস করা। ভার্সাই সম্মেলনের প্রতিটি পদক্ষেপে বাস্তববাদীর কাছে আদর্শবাদীর পরাজয় ঘটেছিল। বাস্তববাদীকে সাহায্য করেছিলেন মধ্যপন্থাবলম্বী লয়েড জর্জ কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়।

ক্লেমসোঁ বা লয়েড জর্জের বিরোধিতা উইলসনের নীতির ব্যর্থতার প্রধান কারণ নয়, প্রধান কারণ ইয়োরোপ সম্পর্কে উইলসনের অবাস্তব ধারণা। তাঁর ব্যর্থতার দ্বিতীয় কারণ, যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ, বিশেষত পূর্ব ইয়োরোপের জটিল পরিস্থিতি। সেখানে চৌদ্দ দফা নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে নীতিগুলির স্ববিরোধিতা প্রকট হয়ে ওঠে। (১) পোলান্ডকে সমুদ্রে যাবার পথ দিতে গেলে জার্মানি বঞ্চিত হয়। এড্রিয়াটিক সাগর অঞ্চলে ইতালি আর যুগোশ্লোভিয়ার দাবি মেনে নিতে গেলে, ন্যায়নীতি বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নীতি—কোনো নীতিই সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। পারস্পরিক আদানপ্রদান ও বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে সমস্যার মীমাংসা করা গেলেও, তাতে কোনোপক্ষই সন্তুষ্ট হয়নি। (২) জার্মানিকে এককভাবে যুদ্ধের জন্য দায়ী করে তার ওপর বিপুল ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতিতে ও জার্মান অর্থনীতিতে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়ানো সম্ভব হয়নি। (৩) উপনিবেশগুলি পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়নীতির পরিচয় পাওয়া যায়নি। (৪) প্রতিটি রাষ্ট্রেই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অবস্থানের ফলে ভবিষ্যৎ জটিলতার রীজ রোপিত হয়েছিল।

এছাড়া ক্লেমসোঁ বুঝেছিলেন এবং জার্মানির ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রমাণ করেছিল, সবচেয়ে গণতান্ত্রিক সংবিধানও আগ্রাসী সমরবাদ ও উগ্র-জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে না।

এমন কি, উইলসনের ব্যক্তিগত সহযোগিতাতেই প্যারিসে 'মুক্ত রাজনীতি'র আদর্শ পরিত্যক্ত হয়েছিল। বৃহৎ চতুঃশক্তি চূড়ান্ত গোপনীয়তার মধ্যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের পক্ষে জনমত বা প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

চাতুর্য ও কঠোরতায় উইলসন কিছু কম ছিলেন না। সম্মেলনে কোনো কোনো মুহূর্তে শঠতা এবং হিংস্রতার মধ্যে দিয়ে উইলসন তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন—যেমন, রাইনল্যান্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের প্রশ্নে তিনি প্যারিস পরিত্যাগ করার ভয় দেখিয়েছিলেন—অথবা অর্লাণ্ডোকে ডিঙিয়ে তিনি ইতালীয়দের আবেদন জানিয়েছিলেন।

ডেভিড টমসন মনে করেন, সম্মেলনে উপস্থিত রাষ্ট্রনীতিবিদদের কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই দায়িত্ব ছিল না, নিজ নিজ দেশের পার্লামেন্ট এবং জনমতের প্রতিও তাঁদের দায়বদ্ধ থাকতে হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভার্সাই চুক্তির এক শক্তিশালী বিরোধী গোষ্ঠী ছিল। অনেক মার্কিনী মনে করতেন, এই চুক্তি জার্মানির পক্ষে যথেষ্ট কঠোর নয়, আবার উদারনৈতিকরা মনে করতেন, এটি অত্যন্ত কঠোর। এছাড়া, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল ঝোঁক ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ তার বাণিজ্য ও শিল্পকে রক্ষা করতেই ব্যস্ত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন সেনেটাররা উইলসনের সিদ্ধান্তকে সার্বিক সমর্থন জানাননি।

জাতীয়তার ভিত্তিতে তাদের ন্যায্য অধিকারীদের পুনরায় ফেরৎ দেওয়া হয়। এর ফলে বেশ কয়েকটি নতুন জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

সামগ্রিকভাবে জার্মানির ক্ষতি ছিল পূরণযোগ্য। ইয়োরোপীয় মহাদেশে তার ভৌমিক সঙ্কোচনের পরিমাণ ছিল সীমিত। ১৮৭০ সালের আগে আলসাস লোরেন ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। জার্মানিতে এব্যাপারে কেউ আপত্তি জানায়নি। পোলিশ করিডরের বাসিন্দারা অধিকাংশই ছিল পোল, কাজেই সেখানে জার্মানির কোনো জাতিগত দাবি ছিল না। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের বিকল্প অন্যত্র পূরণ করা সম্ভব ছিল। রূঢ় ও সার অঞ্চলে উৎপাদিত লোহা জার্মানির অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটিয়েও ফ্রান্সের ক্ষতিপূরণ করতে পেরেছিল। জার্মানি ডেনমার্ক ও বেলজিয়াম ছাড়া অন্য কোনো দেশকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়নি। বুলগেরিয়াকে বাদ দিলে, জার্মানির অন্যান্য মিত্র রাষ্ট্রের তুলনায় তার ভৌমিক ক্ষতি ছিল সবচেয়ে কম। সর্বোপরি, তার ভৌমিক ক্ষতি তার ভবিষ্যৎ পুনরুজ্জীবনের পথ রোধ করতে পারেনি, অথচ তার মিত্র রাষ্ট্রগুলি কোনোদিনই তাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানিই ছিল ইয়োরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। তাই, এ. জে. পি. টেলরের মতে জার্মানির অন্তর্নিহিত শক্তি অটুট ছিল। অন্যদিকে, ইয়োরোপকেন্দ্রিক পুরাতন শক্তিসাম্য ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু জার্মানিকে সংযত রাখার মতো কোনো বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়নি।

এমন কি, ভার্সাই চুক্তির কঠোরতাকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণও বলা যায় না। অধ্যাপক এ. জে. পি. টেলর দেখিয়েছেন, ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধ সমালোচনাই হিটলারের উত্থানের প্রধান কারণ হয়ে থাকলে ১৯২৩ সালেই হিটলারের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা সফল হত। কিন্তু হিটলার ক্ষমতা দখল করেছিলেন ১৯৩৩ সালে। তবে ভার্সাই চুক্তি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে জার্মানির গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল। ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ভাইমার গণতান্ত্রিক সরকার জার্মান জনগণের পরাজয় ও আত্মসমর্পণের সূচক হয়ে উঠেছিল। ফলে জার্মানিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জার্মান রাজনীতিতে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলির প্রভাব বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়।

১.২.৩ ভার্সাই চুক্তি ও উইলসনীয় আদর্শবাদ

পূর্ববর্তী শান্তিচুক্তিগুলির সঙ্গে ভার্সাইচুক্তির প্রধান পার্থক্য ছিল তার আদর্শগত ভিত্তি। এই আদর্শবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (১৮৫৬-১৯২৪) প্রস্তাবনা অংশে আমরা তাঁর কথা উল্লেখ করেছি। এখানে আমরা বিস্তারিতভাবে শান্তিসম্মেলনে তাঁর ঘোষিত নীতির তাৎপর্য আলোচনা করব।

উইলসন বিশ্বশান্তি বিনষ্ট করার জন্য তিনটি প্রবণতাকে দায়ী করেন—গোপন কূটনীতি, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতি অবিচার ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ—(১) গোপন কূটনীতির অবসান ঘটিয়ে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যা ও বিবাদের মীমাংসা করতে হবে। (২) জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাম্যের ভিত্তিতে সমস্ত অবহেলিত জাতিকে মুক্ত করে তাদের পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে হবে। (৩) স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

উলসন প্রস্তাবিত চৌদ্দ দফা শর্তের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি হল—(১) গোপন কূটনীতির পরিবর্তে উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ; (২) শান্তি বা যুদ্ধের সময় সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের পূর্ণ স্বাধীনতা ; (৩) শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অবাধ বাণিজ্যিক আদান-প্রদান; (৪) আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে প্রয়োজনীয়

গিয়েছিল। জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য ও শিল্পপণ্যের সরবরাহ ছিল অপর্যাপ্ত। এই অবস্থায় ভার্সাই চুক্তির অর্থনৈতিক শর্তসমূহ শুধু জার্মানিকে নয়, গোটা ইয়োরোপকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণের কোনও সমাধানসূত্র বার করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং জার্মানির ওপরে বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ চাপানোর ফলে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা লুপ্ত হয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জার্মানির ওপরে চাপানো অর্থনৈতিক শর্তাদি সংক্ষেপে তাঁর মতে, যুদ্ধের ফলে ইয়োরোপে 'সুখের যুগে'র অবসান হয়েছিল। ("The real task of the Peace Conference was to reestablish life and to heal wounds; ..... instead the moralism of Wilson, the demagogy of Lioyd George, the vindictive patriotism of Clemenceau and the greed of a score of little states resulted in a Carthaginian peace.") [J. M. Keynes, *The Economic Consequences of the Peace (1920)]*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসি ঐতিহাসিক মানতু (Etinne Montoux) তাঁর লেখা *The Carthaginian Peace or the Economic Consequneces of Mr. Keynes.* 1946 বইটিতে দেখান, কেইন্‌স্‌ যে আশঙ্কা করেছিলেন, বাস্তবে তা ঘটেনি। ভার্সাই চুক্তির ফলে, জার্মানির অর্থনীতির কোনও চূড়ান্ত ক্ষতি হয়নি। বস্তুত, ক্ষতিপূরণ শর্তাবলির মধ্যে বহু শর্তই কঠোরভাবে প্রয়োগ করা যায়নি। তাঁর মতে এই চুক্তির অর্থনৈতিক শর্তের ক্ষতির দিকটি অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে। আসলে, এই চুক্তির রাজনৈতিক দুর্বলতাই ভবিষ্যতের পক্ষে বেশি ক্ষতিকারক হয়েছিল।

চতুর্থত, অধ্যাপক ই. এইচ. কার, গ্যাথর্নহার্ডি প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে ভার্সাই চুক্তির কঠোরতার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া রূপেই জার্মানিতে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে। পরবর্তীকালে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানি বলপূর্বক ভার্সাই চুক্তি সংশোধনের চেষ্টা করে এবং এ থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি প্রস্তুত হয়।

উপরোক্ত মতের বিরুদ্ধে অন্য ঐতিহাসিকদের বক্তব্য, পৃথিবীর কূটনৈতিক ইতিহাসে সব সময়েই বিজয়ী শক্তি বিজিতের ওপর একতরফা শর্ত আরোপ করে। এদিকে থেকে ভার্সাই চুক্তিতে প্রথম জবরদস্তিমূলক চুক্তি বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, জার্মানি নিজেই ১৮৭১ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট সন্ধির শর্ত অনুসারে ফ্রান্সের প্রতি নির্মম আচরণ করেছিল। এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বলশেভিক রাশিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত ব্রেস্টলিটভস্কের চুক্তি এবং রুমানিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত বুখারেস্টের সন্ধি চুক্তিতে জার্মানির নির্মম স্বার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয়, ভার্সাই চুক্তি যে যুদ্ধবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে সম্পাদিত হয়েছিল, সেই সময়ের পারস্পরিক ঘৃণা ও সন্দেহের পরিমণ্ডলে কোনো ন্যায্য চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব ছিল না। চতুর্থত, ডেভিড টমসন দেখিয়েছেন, ভার্সাই চুক্তি-প্রণেতাদের বিশ্ব-রাজনীতিতে নতুন শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। ভবিষ্যতে জার্মানিতে সমরবাদী আক্রমণাত্মক রাষ্ট্রের উত্থানকে প্রতিহত করার চেষ্টা পদে পদে চুক্তি-প্রণেতাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

জে. নে. রে, এম. ট্রাক্টেনবার্গ (Trachtenberg) এবং ডাবলিউ. এ. ম্যাকডুগাল (McDougall) প্রভৃতি আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির তুলনায় ফ্রান্সের ক্ষতি হয়েছিল অনেক বেশি। ফ্রান্সের তুলনায় জার্মানির শিল্পকেন্দ্রগুলি অটুট ছিল, কারণ যুদ্ধ ঘটেছিল জার্মানির সীমানার বাইরে। কাজেই ফ্রান্সের ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তার দাবী ছিল যুক্তিযুক্ত। এক ফরাসি সমালোচকের মতে ভার্সাই চুক্তিটি কঠোরতার দিক থেকে যথেষ্ট মৃদু ছিল (Too mild for its severity)।

তাছাড়া, ভার্সাই চুক্তি-প্রণেতাদের অন্যতম প্রথম দায়িত্ব ছিল জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপকে পুনর্গঠিত করা। জার্মানিকে পুরোপুরি ধ্বংস না করে অধীনস্থ রাজ্যগুলিকে

জার্মান প্রচার মাধ্যমে এই সন্ধিটিকে জবরদস্তিমূলক শান্তিচুক্তি (dictated peace : *diktat*) বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। জার্মান সেনাধ্যক্ষ এবং রক্ষণশীল রাজনীতিবিদদের মতে, কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রবাদী ও ইহুদিরা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে—তাদের পিছন থেকে ছুরি মারা হয়েছে (stab in the back)। জার্মান সেনানায়করা মনে করতেন জার্মানি যুদ্ধে পরাজিত হয়নি।

পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে মীমাংসায় না এসে বিজয়ী শক্তিবর্গ বিজিত দেশগুলির ওপর এই সন্ধিটি চাপিয়ে দিয়েছিল। বাস্তবে, প্রায় প্রতিটি সন্ধিচুক্তিই নির্দেশমূলক চুক্তি, কারণ একটি বিজিত দেশ স্বেচ্ছায় তার পরাজয়ের ফলাফল বড় একটা মেনে নেয় না। কিন্তু আধুনিক কালে সম্পাদিত অন্যান্য চুক্তির তুলনায়, ভার্সাই সন্ধিতে বিজিত শত্রুর প্রতি বিজেতার হুকুমদারির মনোভাব বেশিমাত্রায় দেখা যায়। অধ্যাপক ই. এইচ. কারের মতে, ভার্সাইতে জার্মানি প্রতিনিধিদের হাতে যে খসড়া চুক্তি দেওয়া হয়েছিল, তার ওপর তাদের লিখিত মতামত পেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। জার্মান প্রতিনিধিদের মতামতগুলির কিছু বিবেচনা করে সংশোধিত ভাষ্যটি তাদের হাতে তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুমকি দেওয়া হয়, পাঁচদিনের মধ্যে চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হবে। সন্ধির খসড়া পেশ ও সন্ধিতে স্বাক্ষরদান : এই দুটি অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোনো সময় জার্মান প্রতিনিধিরা মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিরা মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হন নি। এমন কি এই দুটি অনুষ্ঠানেও সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে সাধারণ ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখানো হয়নি। স্বাক্ষরদান অনুষ্ঠানে দুই জার্মান স্বাক্ষরকারীদের মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে দেওয়া হয়নি। আসামীদের যেভাবে আদালতের কাঠগড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেভাবে তাদের রক্ষীপরিবৃত অবস্থায় আলোচনা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যুদ্ধকালীন তিক্ততা থেকে উদ্ভূত এইসব অপ্রয়োজনীয় অপমান জার্মানি এবং অন্যত্র এক সুদূরপ্রসারী মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল জার্মানি ও অন্যান্য দেশের জনমতের এক বিরাট অংশ প্রকারান্তরে বিশ্বাস করেছিল, জার্মানির কাছ থেকে জোর করে আদায় করা অনুমোদন, নৈতিকভাবে জার্মানির পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়।

ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সমালোচনা—এই সন্ধির শর্তাবলী জার্মানির পক্ষে কঠোর ও নির্মম, জার্মানিকে রাজনৈতিক ও সামরিক বিভিন্ন দিক থেকে দুর্বল ও পঙ্গু করে রাখার চেষ্টা করা হয়।

রাইন অঞ্চলকে বেসামরিকীকরণ করা হয়। এছাড়া, জার্মানিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে এক বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। সামরিক শর্তগুলিতে বিজয়ী ও বিজিত : উভয় পক্ষের পারস্পরিক দায়িত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় জার্মানি এককভাবে এই শর্তগুলি পালনে ব্যর্থ হয়।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক দিক থেকে শিল্পপ্রধান সার অঞ্চল জার্মানির হাতছাড়া হয়ে যায়। জার্মানি শতকরা ১৫% কৃষিক্ষেত্র শতকরা ১২% শিল্পক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত হয়। ভার্সাই চুক্তির অর্থনৈতিক ফলাফল আলোচনা প্রসঙ্গে বিখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ কে. এম. কেইনস্-এর বক্তব্যের উল্লেখ করা যায়। ১৯১৯-এর শেষে কেইন্স রচিত *The Economics Consequences of the Peace* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই বইটি ইয়োরোপে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছিল। কেইন্স ভার্সাই সম্মেলনে ব্রিটেনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার আগেই তিনি পদত্যাগ করেন। তিনি ভার্সাই চুক্তির অর্থনৈতিক শর্তের তীব্র সমালোচনা করেন।

কেইন্সের মতে, মহাযুদ্ধের আগে ইয়োরোপীয় অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব শিল্পগত বিকাশ হয়েছিল। প্রচুর মূলধন অর্জন করে ইয়োরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি নিজেদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে মূলধন রপ্তানি করে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশে সাহায্য করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের ফলে ছবিটি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। মহাদেশের বড় অংশে অর্থনীতি মৃত প্রায় হয়ে

প্রতিষ্ঠা করে এবং সেভেরের চুক্তি মানতে অস্বীকার করে। মুস্তাফা কামাল শেষপর্যন্ত তুরস্ককে বিদেশি প্রভাবমুক্ত করেন। কামাল প্রথমেই আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শ ঘোষণা করেছিলেন।

১৯২৩ সালের জুলাই মাসে তুরস্ক উত্তর আফ্রিকা এবং আরব-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি থেকে দাবি প্রত্যাহার করে নেয় এবং সাইপ্রাস দ্বীপকে ইংরেজের অধীনতাভুক্ত বলে স্বীকার করে নেয়। তারপর ২৩ জুলাই তুরস্ক ও মিত্রপক্ষের মধ্যে লোকসানের (Lausanne) চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে তুরস্ক পশ্চিম দিকে মারিস্তা নদী পর্যন্ত পূর্ব থ্রেস ফিরে পায়। কনস্ট্যান্টিনোপলকে তুরস্কের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়। স্ট্রেইট্স্ অঞ্চলের বেসামরিকীরণ করা হয় এবং শান্তির সময় এই অঞ্চলকে সকল জাতির জাহাজের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তুরস্ক যুদ্ধে নিযুক্ত হলে শত্রুপক্ষের জাহাজ স্ট্রেইট্স্ অঞ্চলে ঢুকতে পারবে না। ইজিয়ান সমুদ্রের ছোট দ্বীপগুলি তুরস্ক, গ্রীস ও ইতালি ভাগ করে নেয়। ক্ষতিপূরণ, নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি সেভরের সন্ধির দমনমূলক শর্তগুলি বাতিল হয়। তুরস্ক একটি প্রজাতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংখ্যা সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ : নবসৃষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তা ও সুযোগসুবিধার সমস্যাটি জটিল আকার ধারণ করে। জাপান-প্রস্তাবিত সকল জাতির সমান অধিকারের প্রস্তাব সমর্থিত হয়নি। তবে, সংখ্যালঘু সমস্যাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তারক্ষার জন্য নূতন রাষ্ট্র কমিটি (New States Committee) নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি সংখ্যালঘুদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দিতে চায়নি। তবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ধির মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। সামগ্রিক ভাবে সংখ্যালঘুদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘকে দেওয়া হয়।

১.২.২. ভার্সাই চুক্তি ও জার্মানি

ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য সমকালীন ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাস্তবে, ভার্সাই সন্ধি সম্পাদিত হবার আগে যে প্রবল আশার সঞ্চার হয়েছিল, আর চুক্তি সম্পাদনের পর নৈরাশ্য এত প্রবল তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল পারিস শান্তি সম্মেলনের প্রকৃত কৃতিত্ব বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছে। এক সমসাময়িক কূটনৈতিকের ভাষায়, "আমরা যদি যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্যে যুদ্ধ করে থাকি, তবে নিঃসন্দেহে শান্তির অবসান ঘটানোর জন্য শান্তি স্থাপন করেছি।" ("".....if we made war to end war, we have certainly made peace to end peace.") [Croizer, A. J., *The causes of the Second World War*] প্যারিসের শান্তিচুক্তি এক প্রজন্মের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। একনায়কতন্ত্র, গণহত্যা এবং ব্যাপক মারণযজ্ঞ বিপর্যস্ত করে তোলে আন্তর্জাতিক জীবন। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে লয়েড জর্জ লিখছেন, "গোটা ইয়োরোপ বৈপ্লবিক মানসিকতায় পরিপূর্ণ। ইয়োরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের সাধারণ মানুষ বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছে।

("The whole of Europe is filled with the spirit of Revolution. The whole existing order in its political, social and economic aspects is questioned by the masses of population from one end or Europe to the other.") ভার্সাই চুক্তির তাৎপর্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে দুটি পরস্পরবিরোধী মত প্রচলিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিকই মনে করতেন, ভার্সাই সম্মেলনে ন্যায়নীতি ও সততা বিসর্জন দিয়ে জার্মানির প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ১৯২০-এ দশকে অধ্যাপক ডাবলিউ. এইচ. ডসনের মতো ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করতেন অ-জার্মান জনগোষ্ঠীর স্বার্থে জার্মান স্বার্থের হানি করা হয়েছে। বিজয়ী মিত্রশক্তি জার্মানির প্রতি এক কঠোর না হলে, সম্ভবত জার্মানি চুক্তির শর্তগুলি স্বেচ্ছায় মেনে নিত।

নিউলির চুক্তি (১৯১৯) ; ২৭ নভেম্বর মিত্রপক্ষের সঙ্গে বুলগেরিয়ার নিউলির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রতিরক্ষার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিম বুলগেরিয়ার চারটি ছোট ছোট ভূখণ্ড যুগোশ্লোভিয়াকে দেওয়া হয়, অথচ এই অঞ্চলগুলিতে বুলগেরিয়ারই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। (২) পশ্চিম থ্রেস ও ইজিয়ান উপকূল গ্রীসকে দেওয়া হয়, যদিও বুলগেরিয়া ঈজিয়ান উপকূলে যাওয়া-আসার অধিকার লাভ করে।

সামরিক ক্ষেত্রে বুলগেরিয়ার সৈন্যসংখ্যা ২০,০০০-এ সীমায়িত করা হয় এবং নৌ-বাহিনী অবলুপ্ত করা হয়।

বুলগেরিয়ার কাছ থেকে ৩৮ বছর ধরে ৫% সুদসহ ৯০,০০০,০০০ পাউন্ড দাবি করা হয়। বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কারণে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। শেষ পর্যন্ত বুলগেরিয়া এক-তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ দেয়।

বুলগেরিয়া এই চুক্তিকে যুক্তিযুক্ত মনে করেনি। হাঙ্গেরির মতো বুলগেরিয়াও অন্তর্বর্তী পর্বে একটি সংশোধনবাদী* দেশ হয়ে ওঠে।

ট্রিয়ানের সন্ধি (১৯২০) ; দীর্ঘ বাদ-বি-সম্বাদের পর হাঙ্গেরীয়রা ট্রিয়ানের সন্ধি করে ১৯২০ সালের ৪ জুন। হাঙ্গেরী বানাতের অধিকাংশ, যুগোশ্লোভিয়া ও রুমানিয়াকে দিতে বাধ্য হয়। ট্রানসিলভানিয়া দেয় রুমানিয়াকে এবং শ্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়া দেয় চেকোশ্লোভাকিয়াকে।

এছাড়া, হাঙ্গেরির সৈন্যিসংখ্যা ৩৫,০০০-এ সীমায়িত করা হয় এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হাঙ্গেরিকে বাধ্য করা হয়। জার্মানির মতোই হাঙ্গেরির সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে মীমাংসা না করে টুকরো টুকরো করে মীমাংসা করা হয়েছিল। সন্ধিচুক্তি সম্পাদনে বিলম্ব হওয়ায় সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে। নবগঠিত হাঙ্গেরির আয়তন ছিল প্রাচীন হাঙ্গেরির এক-তৃতীয়াংশ, মোট জনসংখ্যা ছিল পূর্বতন জনসংখ্যার শতকরা ৪১.৬%। হাঙ্গেরির মাগেয়ার জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির অন্তর্গত হয়েছিল। সীমান্তের বাইরে সংখ্যালঘু ম্যগেয়ার জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি হয়ে উঠেছিল বাস্তব বা অলীক বিক্ষোভের সূত্র। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে হাঙ্গেরি অন্যতম গুরত্বপূর্ণ সংশোধনবাদী রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল।

সেভর্ ও লোসানের সন্ধি (Sevres and Lausanne)—যদিও ১৯২০ সালে লয়েড জর্জ হাউস অফ কমনস্-এর সভায় বলেছিলেন সেভর্-এর চুক্তি তুর্কি অধীনতা থেকে অ-তুর্কি জনসাধারণকে মুক্ত করবে, কার্যত এই চুক্তি তুর্কি জনসাধারণকে ইউরোপীয় শক্তিগুলির শাসনাধীন করে তুলেছিল। (১) এশিয়া, মাইনর, থ্রেস, আদ্রিয়ানোপল ও গালিপলি গ্রীসকে দেওয়া হয়। (২) সিরিয়া ফ্রান্সকে ও পালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়া ইংলন্ডকে দেওয়া হয়। (৩) হজ্জাজের রাজাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয়। (৪) তুরস্ক সাম্রাজ্যের আয়তন এশিয়া মাইনরের মধ্যেই সীমায়িত হয়। (৫) তুরস্কের সৈন্যসংখ্যা ৫০,০০০-এ সীমাবদ্ধ করা হয় এবং বিমানবন্দরগুলি মিত্রপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। (৬) কনস্টান্টিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি তুর্কি বন্দরগুলি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়। কনস্টানটিনোপলে বিদেশী বাহিনীর উপস্থিতিতে তুর্কি সুলতান ষষ্ঠ মোহম্মদ ১৯২০ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

ইতিমধ্যে তুরস্কে বিদেশি শক্তিগুলির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মুস্তাফা কামাল পাশার (১৮৮১-১৯৩৮) নেতৃত্বে একটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল অঙ্কারায় অস্থায়ী সরকারের

---

* **সংশোধনবাদী** (revisionist) : জার্মানি, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি যে দেশগুলি ভার্সাই শান্তিচুক্তির সংশোধন বা পরিবর্তন দাবি করতে তাদের সংশোধনবাদী শক্তি বলে চিহ্নিত করা হত।

মানচিত্র - ১

মানচিত্র - ২

(গ) অর্থনৈতিক শর্ত—অর্থনৈতিক দিক থেকে জার্মানিকে দুর্বল করে রাখার চেষ্টা করা হয়। জার্মানির বড় বাণিজ্য জাহাজগুলি ফ্রান্সকে এবং যুদ্ধজাহাজগুলি ইংলণ্ডকে দেওয়া হয়। জার্মানি দশ বছরের জন্য ফ্রান্স, ইতালি ও বেলজিয়ামকে প্রচুর পরিমাণ কয়লা সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। জার্মানি মিত্রপক্ষকে ৫০০০ রেল ইঞ্জিন, ১৫০,০০০ মোটরগাড়ি দিতে বাধ্য থাকবে। পাঁচ বছরের জন্য জার্মানির এলব ও অন্যান্য নদীগুলি আন্তর্জাতিক শাসনাধীনে রাখা হয়। (এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ৩ সংখ্যক এককে আলোচিত হয়েছে।)

(ঘ) সামরিক শর্ত—ভার্সাই সন্ধির পঞ্চম অনুচ্ছেদে সামরিক শর্তগুলি উল্লেখ করা হয়। জার্মানিতে বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহের নিয়ম বাতিল করা হয়। বারো বছরের জন্য কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এক লক্ষ স্বেচ্ছাবাহিনী রাখবার অধিকার দেওয়া হয়। (২) রাইন নদীর পূর্ব তীর থেকে জার্মান সৈন্য অপসারিত হয়। (৩) হেলিগোল্যান্ডে নৌ-ঘাঁটি বিলুপ্ত করা হয়। (৪) জার্মান সেনাপতিদের বরখাস্ত করা হয়। (৫) ভবিষ্যতে জার্মানিকে সমরাস্ত্র নির্মাণ করতে নিষেধ করা হয়। (৬) জার্মান যুদ্ধজাহাজগুলি ইংলন্ডের হাতে তুলে দেওয়া হয়। (৭) রাইন নদীর পশ্চিম তীরের ত্রিশ মাইলের মধ্যে সব জার্মান দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি ভেঙে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়। (৮) সামরিক শর্তগুলি কার্যকর করার জন্য রাইন নদীর বাম তীরে মিত্রপক্ষের সেনাদল মোতায়েন রাখা হয় এবং একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়।

(ঙ) আইনসংক্রান্ত রাজনৈতিক শর্ত—সন্ধির শর্ত ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করার অপরাধে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মকে প্রধান যুদ্ধ-অপরাধী রূপে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু হলান্ডের সরকার পলাতক কাইজারকে মিত্রপক্ষের হাতে তুলে দিতে রাজি না হওয়ায় তাঁর বিচার সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত মাত্র বারো জনকে জার্মানির আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়।

ভার্সাই সন্ধির মূল নীতি অনুসরনে অন্যান্য পরাজিত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মিত্রপক্ষের সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। 'সাঁ জামাঁর (St. Germain') চুক্তি (১৯১৯)—১০ সেপ্টেম্বর অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মিত্রপক্ষের সাঁ জামাঁর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রাচীন হ্যাবস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে নতুন রাষ্ট্রগুলি জন্মলাভ করে। (১) অস্ট্রিয়-হাঙ্গেরির যুক্ত সাম্রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করা হল। (২) নতুন অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রের আয়তন সংকুচিত করা হয় এবং জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ সংযুক্তির বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। (৩) বোহেমিয়া, মোরাভিয়া ও অস্ট্রিয় সাইলেশিয়া নিয়ে নতুন রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়া গঠিত হয়। (৪) যুগোশ্লোভিয়া গড়ে ওঠে শ্লোভানিয়া, সার্বিয়া ও ক্রোয়াসিয়াকে নিয়ে। (৫) পোলান্ড গালিসিয়া, ও রুমানিয়া বুকাভিনা ও ট্রানসিলভানিয়া লাভ করে। (৬) ইতালি ত্রিস্ত (Trieste) ও সংলগ্ন পশ্চাদভূমি অধিকার করে। ইতালিকে ব্রেনার সীমান্ত দেওয়ার জন্য জার্মান অধ্যুষিত দক্ষিণ টাইরল ইতালির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জার্মানির হাতে অস্ট্রিয়ারও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিলুপ্ত করা হয়। অস্ট্রিয়া মিত্রপক্ষকে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা অর্পণ করে। দানিয়ুব নদী-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ শর্ত অস্ট্রিয়া মেনে নিতে বাধ্য হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার আর্থিক দুর্দশা শোচনীয় হয়ে ওঠে। ভিয়েনাকে বেশ কিছুদিন অনাহারে কাটাতে হয়েছিল। এর ফলে মিত্রপক্ষ অর্থনৈতিক ধারণাগুলি কার্যকর করার চেষ্টা করেনি। অস্ট্রিয়ার ক্ষতিপূরণ কমিশন একটি ত্রাণ সংগঠনে পরিণত হয়েছিল।

অস্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যাকে ৩০,০০০-এ সীমায়িত করা হয়, ভবিষ্যতে সৈন্য নিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়। যুদ্ধ উপকরণ ও যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা হ্রাস করা হয়।

বছরের জন্য জাতিসংঘের কমিশনের অধীনে রাখা হল। ভবিষ্যতে গণভোটের মাধ্যমে ওই অঞ্চলের ভাগ্য নির্ধারণ করা স্থির হয়। যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের কয়লাখনি বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে সার অঞ্চলের মালিকানা ফ্রান্সের হাতে হস্তান্তরিত হল। নবজাত চেকোশ্লোভাকিয়া হালস্ চিন (Hultschin District) জেলা লাভ করল। সুদেতেনল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়ার বাসিন্দারা অনেকে জাতিগত ও ভাষাগত দিক থেকে জার্মান হলেও পূর্বতন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের নাগরিক হিসেবে তারা রাজনৈতিকভাবে জার্মান ছিল না ; তবু অস্ট্রিয়ার নাগরিকরা জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী ছিল। সুদেতেনল্যান্ড ছিল ঐতিহাসিক বোহেমিয়া রাষ্ট্রের অংশ। চুক্তি-প্রণেতারা ঐ অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক জার্মান জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হলেও ফ্রান্স এ ব্যাপারে আপত্তি করে। জার্মানি ও অস্ট্রিয়া তাদের সংবিধান থেকে সংযুক্তি সংক্রান্ত ধারা বাদ দিতে বাধ্য হয়।

জার্মানির উত্তর সীমান্তে স্লেজউইগ প্রদেশটি ডেনমার্ককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২০ সালে গণভোটের মাধ্যমে উত্তর স্লেজউইগের শতকরা ৭৫% মানুষ ডেনমার্কে এবং দক্ষিণে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ জার্মানির সঙ্গে সংযুক্তি চায়।

পূর্বদিকে জার্মানি প্রথম মিত্রশক্তি ও সহযোগী শক্তিগুলির হাতে মেমেল বন্দর ছেড়ে দেয়। এই বন্দরটি লাভ করে লিথুয়ানিয়া।

পোল্যান্ডের ভাগ্য নির্ধারণের প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে। জার্মানি পোলান্ডকে ছেড়ে দেয় পোসেন (Posen) নামক প্রদেশটি, পশ্চিম প্রাশিয়ার অধিকাংশ এবং সমুদ্র উপকূলে যোগস্থাপনকারী প্রায় চল্লিশ মাইল দীর্ঘ পথ। এই পথ (Polish Corridor) পূর্ব প্রাশিয়াকে জার্মানি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে। চৌদ্দ দফা শর্ত অনুসারে ডানজিগ বন্দরকে একটি মুক্ত নগরী বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ডানজিগ পোলান্ডের শুল্ক অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ডানজিগের বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার দায়িত্ব ও দেওয়া হয় পোল্যান্ডকে।

উত্তর সাইলেসিয়ার দুই লক্ষ বাসিন্দার ভাগ্য নির্ধারিত হয় গণভোটের মাধ্যমে। পশ্চিম প্রাশিয়ার ম্যারিয়েনওয়ার্ডার (Marienwerder) এবং পূর্ব প্রাশিয়ার আলেনস্টাইন (Allenstein) জেলায় ১৯২০ সালের গণভোটে জার্মানরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কয়েকটি গ্রামে পোলদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সেগুলি পোলান্ডকে হস্তান্তরিত করা হয়। কয়লা এবং লৌহ আকরে সমৃদ্ধ উত্তর সাইলেশিয়ায় গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। শতকরা ৬০% ভোট পড়ে জার্মানির পক্ষে এবং ৪০% পোলান্ডের পক্ষে। শেষপর্যন্ত জাতিসংঘ পরিষদ, মোট জনসংখ্যা ও জমির অর্ধেকের বেশি জার্মানিকে দিলেও, আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি পোলান্ডের হাতে তুলে দেয়।

(খ) ভার্সাই সন্ধির ঔপনিবেশিক শর্ত অনুসারে পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলির ওপর জার্মানির অধিকার লুপ্ত হয়। পূর্ব এশিয়ার জার্মান উপনিবেশগুলি লাভ করে জাপান। জার্মানির অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের (ম্যান্ডেট*) অভিভাবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মিত্রশক্তি অধিকৃত অঞ্চলে জার্মান নাগরিক বা কোম্পানির সব সম্পত্তি ও অধিকার বাজেয়াপ্ত করা হয়।

---

* ম্যান্ডেট ব্যবস্থা—জাতিসঙ্ঘের সংবিধান অনুসারে পরাজিত শক্তিগুলি অপসারিত হবার পর পরিত্যাক্ত রাজ্যগুলিতে "বসবাসকারী জনগণ যদি আধুনিক জগতের জটিল পরিস্থিতিতে আত্মনির্ভরশীল না হতে পারে, তাহলে তাদের উন্নত দেশসমূহের অভিভাবকত্বে রাখা হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে উন্নত দেশগুলি এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা প্রয়োগ করবে।"

যুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করে জার্মানিকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু শান্তি সম্মেলনে আহূত হবার পর তিনি আমেরিকা ও ফ্রান্সের দুই বিপরীত মতের সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা করেন।

উড্রো উইলসন, জর্জ ক্লেমেসোঁ, লয়েড জর্জ এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী ভিত্তোরিও অর্লান্ডো—এই চারজনই (Big Four) সম্মেলনের নীতি নির্ধারণ ও কর্ম পরিচালনার মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যান্য সদস্যরা আড্রিয়াটিক সমুদ্রে ফিউম বন্দরের ওপর ইতালির দাবি অস্বীকার করায় অর্লান্ডো সক্রিয় ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ান। তাছাড়া, তিনি ইংরেজি ভাষায় খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। অথচ ইংরেজি ভাষাতেই সম্মেলনের কাজ পরিচালিত হয়েছিল। এরপর থেকে বাকি তিন জনই প্রধান হয়ে ওঠেন।

জার্মানির সঙ্গে মিত্রপক্ষের ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২৮ জুন—এটি ছিল সেরাজেভো হত্যাকান্ডের পঞ্চম বার্ষিকী। তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের চূড়ান্ত শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯২৪ সালের আগস্ট মাস—অর্থাৎ শান্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে লেগেছিল বেশ কয়েক বছর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধোত্তর শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ইয়োরোপকেন্দ্রিক বিশ্বের অবসান ঘটে। রোমানভ, হ্যাবস্‌বার্গ, হোহেনজোলার্ন প্রভৃতি প্রাচীন রাজবংশ শাসিত সাম্রাজ্যগুলি অবলুপ্ত হয়। তাদের জায়গায় গড়ে ওঠে নব-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি। জন্মলগ্ন থেকেই এই রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক, জাতিগত এবং রাজনৈতিক নানান সমস্যায় বিপন্ন হয়ে পড়ে। নানা কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে ইয়োরোপের প্রাধান্য হ্রাস পায়।

১৮৯০ থেকে ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত বিপ্লব ইতিহাসের পালাবদল সূচিত করে। ১৯০০ সাল নাগাদ এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়ায় জনসংখ্যাবৃদ্ধি দ্রুত নগরায়ণ দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ইংলন্ডের একপাক্ষিক প্রাধান্য হ্রাস পায়, ক্রমেই তার স্থান দখল করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে মাথা চাড় দিয়ে ওঠে জাপান। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে ক্রমেই নেতিবাচক দিক থেকে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অর্জন করে। জেফ্রি ব্যারাক্লাফ (Geoffrey Barraclough) দেখিয়েছেন, ইয়োরোপকেন্দ্রিক পৃথিবীর অবসান ঘটেছিল। জন্ম নিয়েছিল বহুমাত্রিক জটিল বিশ্বরাজনীতি। এই রূপান্তরকে প্রায় বৈপ্লবিক রূপান্তর বলা যায়।

১.২.১ ভার্সাই ও অন্যান্য চুক্তির শর্তসমূহ

অধ্যাপক উইলিয়াম আর কেলরের (Keylor) মতে ভার্সাই সম্মেলনের মূল লক্ষ ছিল দুটি ; পৃথিবীর প্রায় অর্ধাংশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মানচিত্র পুনর্গঠন এবং শান্তিপ্রতিষ্ঠা।

ভার্সাই চুক্তিতে প্রায় ৪৪০টি ধারা ও অজস্র সংযোজন যুক্ত হয়েছিল। জার্মান রাজনীতিবিদরা সহজে এই চুক্তি মেনে নেননি। চ্যান্সেলার ফিলিপ শাইডেমান (Scheidemann) এই অপমানজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করার চেয়ে পদত্যাগ করাই শ্রেয়তর মনে করেন। ক্যাথলিক দলের নেতা এরৎসবার্গার বুঝতে পেরেছিলেন চুক্তি স্বাক্ষরে অসম্মতি জানালে জার্মানির স্বাধীনতা বিপন্ন হবে, তাই তিনি ভার্সাই চুক্তি অনুমোদন করাই যুক্তিযুক্ত বোধ করেন।

(ক) **আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রিক পূনর্বিন্যাস** : পশ্চিম সীমান্তে জার্মানি ফ্রান্সকে আলসাস ও লোরেন ফিরিয়ে দিল, বেলজিয়ামকে দুটি ছোট অঞ্চল—ইউপেন (Eupen) ও মামেডি (Malmedy) ছেড়ে দিল এবং লাক্সেমবার্গের সঙ্গে গঠিত পূর্বতন শুল্ক সংঘ থেকে বেরিয়ে এল। সারের (Saar) কয়লাখনি অঞ্চল পনেরো

হয় তা অনতিবিলম্বে এক বিশ্বযুদ্ধের রূপ নেয়। মিত্রপক্ষের সদস্য ছিল ; ইংলন্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া আর কেন্দ্রীয় শক্তির অন্তর্গত জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও তুরস্ক। ১৯১৫ সালে ইতালি মিত্রপক্ষে যোগদান করে। যুদ্ধ চলতে চলতে ১৯১৭ সালে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। একদিকে** সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে রাশিয়া যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়। অন্যদিকে জনমতের চাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য হয়ে মিত্রপক্ষে যোগদান করতে হয়।

এর আগে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনও যুদ্ধ এত ব্যাপক আকার ধারণ করেনি। এত বেশি সংখ্যক দেশ কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি, অথবা এত উন্নত প্রযুক্তির মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হয়নি। বিষাক্ত গ্যাস, ডুবোজাহাজ, ট্যাঙ্ক এবং বোমারু বিমান বিষিয়ে তুলেছিল পৃথিবীর আকাশ বাতাস। ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে নিহত হয়েছিলেন ১০,০০০,০০০০ মানুষ এবং আহত হয়েছিলেন ২০,০০০,০০০০ মানুষ। প্রত্যক্ষ অর্থক্ষয় হয়েছিল ১৮০,০০০,০০০,০০০ মার্কিন ডলার, পরোক্ষ ক্ষতি ১৫০,০০০,০০০,০০০ মার্কিন ডলার। সামগ্রিকভাবে, পৃথিবীর কোনও দেশ এমনকি ভারতবর্ষও এই ক্ষয়ক্ষতির পুরোপুরি বাইরে থাকতে পারেনি। ১৯১৪ সালের ৩ আগস্ট ইংলন্ড যুদ্ধে যোগদান করার পর, ইংলন্ডের বিদেশ সচিব স্যার এডওয়ার্ড গ্রে মন্তব্য করেছিলেন, "ইয়োরোপের সব আলো নিভে যাচ্ছে, আমাদের জীবদ্দশায় আর এই আলোগুলি জ্বলতে দেখবে না।" (The lamps are going out all over Europe; we shall not see them lit again in our lifetime. (উৎস : David Thomson—Europe Since Napoleon) একটি গোটা প্রজন্মের জীবনকাল কেটেছিল এই আশাহীন অন্ধকারে। ১৯১৮ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় শক্তিগুলি একে একে পরাস্ত হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়া আত্মসমর্পণ করে। ৩০ অক্টোবর তুরস্ক নতিস্বীকার করে। ৪ নভেম্বর অস্ট্রিয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চূড়ান্ত পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে জার্মানির রাজা কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম হল্যান্ডে পালিয়ে যান এবং বার্লিনে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন জার্মান সরকার ১১ নভেম্বর যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রায় ৩২টি দেশের প্রতিনিধি একত্রে মিলিত হয়ে শান্তি স্থাপনের কাজ আরম্ভ করে। ভার্সাই সম্মেলনে মিলিত হয়েছিল মিত্রশক্তি (ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এবং কিউবা, ব্রাজিল, পানামা, গুয়াতেমালার মতো সহায়ক শক্তিগুলি। অনুপস্থিত ছিল গৃহযুদ্ধে লিপ্ত রাশিয়া। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙেরি, বুলগেরিয়া ও তুরস্ক প্রভৃতি পরাজিত কেন্দ্রীয় শক্তিগুলিকে সম্পাদিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করার অনুরোধ জানোনো হয়। চুক্তি শর্ত সম্পর্কে তাদের অভিমত জানানোর কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার প্রায় দশ মাস আগেই মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন (১৯১৮, ৮ জানুয়ারী) মার্কিন কংগ্রেসের সামনে তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দফা নীতি পেশ করেন। তিনি চেয়েছিলেন, গোপন কূটনীতির অবসান ঘটিয়ে, সমুদ্রে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে, অর্থনৈতিক বাধা অপসারণ করে, সকল অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতিকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়ে, একটি জাতিসংঘ গঠন করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আবহাওয়া গড়ে তুলতে।

উইলসনের বিপরীত মেরুতে ছিলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লেমেসোঁ। জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা এবং ফ্রান্সের নিরাপত্তারক্ষাই ছিল তাঁর প্রধান আগ্রহ।

---

* বিসমার্ক : ১৮৬২-১৮৭১ সাল পর্যন্ত প্রাশিয়ার চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনিই ঐক্যবদ্ধ জার্মানির স্রষ্টা এবং ইয়োরোপীয় মৈত্রী ব্যবস্থার জনক।

** ভলাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। সৃষ্টি হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন।

একক ১ ❑ মৈত্রীব্যবস্থা ও তার ফলাফল : ১৯১৯ সালে ইয়োরোপ

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২.১ ভার্সাই ও অন্যান্য চুক্তির শর্তসমূহ

১.২.২ ভার্সাই চুক্তি ও জার্মানি

১.২.৩ ভার্সাই চুক্তির ও উইলসনীয় আদর্শবাদ

১.৩ মৈত্রীব্যবস্থার সামগ্রিক ফলাফল

১.৩.১ পুরাতন ইয়োরোপকেন্দ্রিক শক্তিসাম্যের অবসান

১.৩.২ প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির অবসান ও তৎসংক্রান্ত সমস্যা

১.৩.৩ নবীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বলতা

১.৪ সারাংশ

১.৫ অনুশীলনী, প্রশ্নাবলী ও উত্তরসংকেত

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ১৯১৯ সালে বিজয়ী মিত্রশক্তি ও পরাজিত জার্মানি ও অন্যান্য শক্তিগুলির মধ্যে সম্পাদিত সন্ধিগুলির শর্তসমূহ।
- ভার্সাই সন্ধির প্রতি জার্মানির দৃষ্টিভঙ্গি।
- সামগ্রিকভাবে ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে ১৯১৯ সালে চুক্তিসমূহের ফলাফল।

১.১ প্রস্তাবনা

বিসমার্কের সময়ের পৃথিবী থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়া সম্পূর্ণ আলাদা। মহাযুদ্ধের ফলে বিসমার্কের সময়ের রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান ঘটে। এক নতুন আন্তর্জাতিক বিশ্বের সূচনা হয়।

ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন এসেছিল ১৯১৪ সালের ২৮ জুন বসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভোতে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিক ফার্দিনান্দ ও তাঁর পত্নীর হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে যে ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সূচনা